রেল লাইনের ধারে

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ডাঃ অতীন্দ্র নাথ বসু

শ্রদ্ধাভাজনেষু—

॥ এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৪৬ ॥

॥ লেখিকার অন্যান্য বই ॥

ছোট গল্প

একফালি বারান্দা

সঙ্গোপনে

ছিঃ ছিঃ (যন্ত্রস্থ)

উপন্যাস

মৃগতৃষ্ণিকা

বাঁধন হারা

এবার অবগুণ্ঠন খোল

ভ্রষ্টা

প্রবন্ধ

মহিলা কবি (যন্ত্রস্থ)

এক

ডাক্তার সবিতৃ বুঝি এবার রাহুমুক্ত হতে পারলেন।

বেঙ্গল এ্যাণ্ড আসাম রেলের ডাক্তার সবিতৃ। রিলিভিং পিরিয়ডের যাঁতার মধ্যে দীর্ঘদিন যেন তাঁর সমস্ত দেহ-মন বিষময় হয়ে উঠেছিল।

একটা ডিভিশনে যত ডাক্তার যতবার ছুটি নেবে তাঁকেই সে শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে; ঢাকা আর মক্কা, দিল্লী আর লঙ্কা—বামন অবতারের মতই যেন এক পা স্বর্গে আর এক পা মর্তে রেখে চাকুরীর পরমানন্দ স্নায়ুতে স্নায়ুতে উপভোগ করতে হয়েছে সবিতৃকে। কর্তৃপক্ষের কাছে কত সাধ্য-সাধনা, কত আবেদন নিবেদন কিন্তু সব নাকোচ হয়ে গেছে চাকরীর শৈশবদশা কাটিয়ে উঠতে পারেনি বলে।

একটা মানুষ এক টানা কাঁধে জোয়াল বয়ে চলেছে বছরের পর বছর।

তবুও চাকুরীর জন্য কৃতজ্ঞ ডাঃ সবিতৃ মৈত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়ানক দুর্দিনে এই চাকরীই তো তাঁর পরিবারবর্গকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেদিনের মহামন্বন্তরের হাতছানিতে যখন বেসরকারী মানুষেরা পোকার মত পট্‌পট্ করে মরেছে—সেই বিভীষিকাময় শ্মশানপুরীর দিকে তাকিয়ে সরকারী মানুষরা র্যাশান বরাদ্দ মাফিক অন্ততঃ কিছু খাদ্য গলাঃধকরণ করে আত্মরক্ষা করেছে।

ফসল ফলিয়েছিল যারা তারা কিন্তু অনাহারে মারা যেতে লাগল।

ডাঃ সবিতৃ এবার রাহুমুক্ত হতে পারলেন বৈকি।

রিলিভিং পিরিয়ডের ভূতের বোঝা তাঁর কাঁধ থেকে নামলো।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রায় শেষ হয় হয়, সরকারী চাকুরে মহল আনন্দে মত্ত। যুদ্ধোদ্যোগীদের উৎসাহ আর উদ্দামের অন্ত নেই। আরও সৈন্য-সামন্ত, আরও কর্মী, আরও মানুষ চাই। ওদেরই প্রাণ-প্রাচুর্যের সমারোহে যেন আকাশে জ্বলে উঠবে আলো, সূর্যমুখী ফুটবে।

ইংরেজএর জয় হবে।

যুদ্ধের পরিপূর্ণ মরশুমেও যারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পিছিয়ে ছিল তারাও দলে দলে এগিয়ে এল। ক্যাপ্টেন, মেজর কত র‍্যাঙ্ক কত গৌরব কত মর্য্যাদা!

সুবর্ণ সুযোগ ছাড়া আর কী!

লালসা জেগে ওঠে মানুষের মনে।

ইংরেজকে সাহায্য করতে কত ডাক্তার ফিল্ড সার্ভিসে চলে গেল। সবিতৃ এবার তাঁদেরই পরিত্যক্ত একটি পদে চান্স পেলেন। একটি ডাক্তারখানার সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে পেলেন।

উত্তর বাঙলার রংপুর অঞ্চলে তিস্তার ধারে রেলওয়ে ডাক্তারখানা। রিলিভিং পিরিয়ডে এদিকটায় বহুবার এসেছেন ডাঃ সবিতৃ। পরিচিত জায়গা, পরিচিত মাটি, মাঠ ঘাট মানুষ।

রাহুমুক্ত ডাক্তার মৈত্র বহুদিন পরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

সবিতৃ ডাক্তারের সঙ্গে এই গ্রামের মাটির আর মানুষের বুঝি প্রাণের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল।

বিদায়ী ডাক্তার রমেশ গাঙ্গুলি এখানে বছর পাঁচেক থেকে গেলেন। সবিতৃকে পেয়ে গ্রামের সবাই সুখী। তারা সবিতৃকে ভালবাসে, বিশ্বাস করে। তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে সারাগ্রাম।

হয়তো ভালোবাসা পাবার যোগ্যতা রয়েছে সবিতৃ ডাক্তারের। সংসারে কী সে পেয়েছে, কী পায়নি, আর কী পাবে সে হিসাব

নিকাশ খতিয়ে করবার সময় নেই তাঁর। পাওয়া ওঁর মুঠোয় মুঠোয় ভরে ওঠে। চিকিৎসার মধ্যে তিনি অন্তরের প্রেরণা পান, সে প্রেরণা শিল্পীর সৃষ্টির প্রেরণা। ফি নিয়ে দর কষাকষি করা তার মনুষ্যত্ব-বোধে ঠোক্কর খায়।

সবিতৃর বাবা বলেছিলেন, "ডাক্তারী পাশ করলি, দেশ ছেড়ে চাকরী করতে যাবি কেন? এখানেই প্র্যাকটিস্ কর।"

সবিতৃ উত্তর দিয়েছিলেন, "পরিবারকে রক্ষা করতে আমি চাকরি করবো, রোগীকে সর্বাঙ্গীন আরোগ্য করতে ওদের চিকিৎসা করবো।"

তবু দৈনন্দিন কাজের শেষে ঘাম ভিজা কামিজের পকেট থেকে ঠিক মুড়ি-মুড়কীর মত টাকা পয়সাগুলো বের করবে। এ উপার্জন তার দাবী কিম্বা শোষণে নয়, সেবার উপার্জন। সবিতৃর সৌম্য মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অর্থের সার্থকতায় নয়, সেবারই সাফল্যে।

নিজের উপার্জিত টাকা পয়সাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন সবিতৃ ডাক্তার, উইপোকা খাওয়া আর ইঁদুরে কাটা কত নোট, কত অচল সিকি দুয়ানি, তবু সবিতৃ ডাক্তার দুঃখিত নন, এই তো ডাক্তারের যোগ্য সম্মান, ডাক্তারকে ওরা বিশ্বাস করে, ভালোবাসে, তাই ফাঁকি দিলেও বঞ্চিত করতে পারেনা। সবিতৃ বিশ্বাস করেন, অভাব আর অনটনই স্বভাবধর্মের বিচ্যুতি ঘটায়।

সবিতৃ হেড কোয়ার্টার ছেড়ে ডাক্তারখানার দিকে রওনা হয়েছিলেন। এই ডাক্তারখানার ভার নিয়ে তিনি এসেছেন। দশ বারো মাইল রাস্তা।

ট্রেনের কামরায় টিকিট কালেকটার বলরাম মল্লিকের সঙ্গে দেখা। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, শীর্ণ কাঠির মত রুক্ষ চেহারা। প্রভুত্ব করবার একটা ঔদ্ধত্য ক্রুদ্ধ সাপের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করছে। চোখে চক্‌চক্ করছে লোভাতুর মনের পিপাসা। অভ্যর্থনায় গদগদ হয়ে নমস্কার

জানিয়ে বলরাম বল্‌লো, "নমস্কার ডাক্তারবাবু, আমাদের সৌভাগ্য আপনাকে আমাদের মধ্যে পাচ্ছি"।

সৌভাগ্য বইকি, মৃদু হেসে প্রতি নমস্কার জানিয়ে ডাক্তার মৈত্র বল্‌লেন, "ফির যখন দাবী নেই, জুলুম নেই।"

বিকৃত ঠোঁটের ফাঁকে একটু অবজ্ঞা ছড়িয়ে বলরাম দাঁড়কাক কণ্ঠে বল্‌লো, "ওসব কথা বাদ দিন্ ডাক্তারবাবু, ইদানিং আমাদের রমেশ গাঙ্গুলির জুলুম দিন দিন বেড়েই চলেছিল, আমার স্ত্রীকে ইন্‌জেকসন দিয়ে ফির দাবী করেন। যুদ্ধে গিয়েছে, হাড় জুড়িয়েছে আমাদের।"

ডাঃ সবিতৃ উত্তর দিলেন, "রমেশবাবুর দাবী হয়তো অন্যায় ছিলনা বলরামবাবু। আপনার স্ত্রী যখন এমপ্লয়ী নন তখন তাঁর ফি আপনাকে দিতে হবে বৈকি। ডাক্তারের মাইনে খুব সামান্য। তাঁর এই দিককার পাওনা বিচার করেই কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা করে রেখেছেন। রমেশবাবুর দাবী ন্যায্য বলেই তিনি ফি দাবী করে থাকেন।"

আবার দাঁড়কাকের কর্কশ কণ্ঠ বেজে উঠলো, "অহঙ্কারই তার জীবনের গৌরব-লক্ষ্মী হয়ে রইল ডাক্তারবাবু। রেলসমাজে তার ডাকও নেই।"

ডাক্তার একটু হাসলেন। "এইতো তার যোগ্য পাওনা, বাপের সুপুত্তুররা সিন্দুকের টাকা পরকে বিলিয়ে দেয় দিক্, তবু রেলের ডাক্তার কেন টাকা পাবে?"

প্রসঙ্গকে চাপা দিল বলরামবাবু। সবিতৃকে একটু তোয়াজ করেই বললো, "ডাক্তারবাবু আপনি কিন্তু রোগীপত্রকে বড় বেশী প্রশ্রয় দেন।"

"একটু উদারতা, একটু মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া সকলেরই উচিৎ।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলরামবাবু কী যেন বল্‌তে উৎসুক হয়ে উঠলো। ওকে থামিয়ে দিয়ে ডাক্তার আবার বললেন, "সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মজ্জায় ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে। নৈতিক চরিত্র কেবলই নাম্‌ছে আর

নাম্‌ছে, খান্‌ খান্‌ হয়ে ভাঙ্গছে। এখনও যদি নিজেরা নিজেদের রক্ষা করতে না শিখি এর পরের ধাপে আমরা কোথায় গিয়ে পৌঁছব ?"

বলরাম ফোঁস্‌ করে উঠলো, "ওসব বড় কথা আমি বুঝিনা ডাক্তার-বাবু, আপনি কী বলেন, আপনি ফি না নিয়ে চিকিৎসা করলেই ভারতবর্ষের কি কলঙ্ক ঘুচবে. তার জন্যে তো দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছেই।" .

ডাক্তার বললেন, "আবার সেই একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি মল্লিক মশাই। সেই অসাম্য, সেই বৈষম্য, দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার যদি নিজে খেতে নাই পায় আবার তো সেই জুলুম আর দাবী মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।"

এই সময় গাড়ী ধরেছে তিস্তা জংসন ষ্টেশনে। কয়েকজন চাষা-ভুষো নীচের তলার মানুষ হুড়মুড় করে গাড়ীতে উঠে পড়লো। সেকেণ্ড ক্লাশ। কিন্তু যা ভিড়; আর থামবে মাত্র এক মিনিট। তাই ওরা মরীয়া হয়ে সামনে যে কামরা পেয়েছে তাতেই উঠে পড়তে চায়। হাটে হাটে ওরা কেনা-বেচা করে। দাঁড়কাক চীৎকার করে উঠলো, 'টিকিট, টিকিট কোথায় ? টিকিট দে।"

চাষা-ভুষো মানুষরা মিনতি জানিয়ে বললো, "দেরীতে হাট ভাঙলো বাবু, টিকিট করতে পারিনি, পরের ইষ্টিশনেই থার্ড কেলাশে যেয়ে চড়ব।"

"নাম্‌ হতভাগা,—পরের ইষ্টিশন ! আমার চোদ্দ পুরুষের সব নাওখোলা।"

বলরামের জুতোর ধাক্কায় একটা লোক বেঞ্চ থেকে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেল। "আহা করেন কি বলরামবাবু," সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন সবিতৃ ডাক্তার, "দরজা খোলা রয়েছে নীচে গড়িয়ে পড়ে যাবে।"

"ওদের মরাই মঙ্গল ডাক্তারবাবু। ওরা রেল কোম্পানীকে ফাঁকি দেয়।"

"ফাঁকি ঠিক ওরা দেয়নি মল্লিকমশাই। প্রাণের মমতায় অন্যায় করেছে তা স্বীকার করি। আপনি ওদের ক্ষমা করুন, পরের ষ্টেশনে নামিয়ে দেবেন।"

"ক্ষমা, প্রেম, দয়ার কীর্তন আর করবেন না ডাক্তার বাবু।" কর্কশ কণ্ঠে মল্লিক বললেন, "সংসার-জীবনে ও-সব অচল। আইন আমার কাছে সবার বড়।"

ডাক্তার এবার হেসে উঠলেন। বল্লেন, "প্রেমও নয়, আবৃত্তি নয়, আজকে ভাই ব্যক্তিগত স্বার্থ সব চেয়ে বড়।"

ডাক্তার এবার ওদের উদ্দেশ করে বললেন, "বিনা টিকিটে গাড়ীতে চড়তে জানো, টিকিটবাবুকে সম্মান করতে জানোনা।" একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো টিকিট বাবু। একটু উষ্মা প্রকাশ করেই বললো, "কী করি বলুন? ছা-পোষা মানুষ, মাইনেতে পেট যখন ভরে না—"

আমনা সবিতৃ নিরুত্তর।

সেই বৈষম্য আর অসাম্য, একদিকে জোড়াতালি দিলে আর একদিকে ফুটো হয়ে যায়। গোঁজামিল দিতে গিয়ে গরমিল ঘটে। সমস্যা জটিল।

দুই

বিশীর্ণা তিস্তার কাশবন আর বালুচর পাশে রেখে ছোট্ট একটা জংসন ষ্টেশনে গাড়ী এসে থাম্‌লো। বেলা তখন বারোটা। গাড়ী থাম্‌তেই পুরানো সব চেনা লোকজন ভীড় করে এল। আশে পাশের গ্রামের চাষা-ভুষো মানুষ ওরা। রোদে পোড়া, জলে ভেজা, অনাহার কিংবা অর্দ্ধাহারক্লিষ্ট বিবর্ণ চেহারা। অভ্যর্থনা জানানোর মৌখিক ভদ্রতা ওদের জানা নেই। মৌমাছির মত ছেঁকে ধরলো সবিতৃকে। সরকারী চাকর নমস্কার জানিয়ে বললো, "পুরোনো ডাক্তার ডাক্তারখানায় রয়েছেন, এখুনি চার্জ্জ দিয়ে, বিকেলের মেলে চলে যাবেন।" পরিচিত গ্রাম্য মানুষের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে ডাক্তার বললেন, "আমি কী তোদের জন্যে এলুম রে? আমি যে সরকারী চাকুরে, একথা ভুলিস্‌নে কেন?"

"তাই কী আমরা ভুল্‌তে পারি বাবু।" সবাই একে একে পদধূলি নিয়ে প্রণাম জানিয়ে বললো, "সেই দৌলতেই তোমাকে আমরা পেয়েছি—তুমি দেবতা, একটু প্রণাম জানাতে এসেছি।"

রেললাইনের ধার দিয়ে সবিতৃ ডাক্তার ওদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁট্‌তে লাগলেন, গ্রামের খবর জিজ্ঞেস করলেন। বিকালের দিকে ওদের গ্রামে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডাক্তারখানায় এসে ঢুকলেন।

ডাঃ গাঙ্গুলি একটা ইজি চেয়ারে উদাস মনে বসে কি একটা বইএর পাতা ওলটাচ্ছিল।

"কী হে গাঙ্গুলি, বুড়ো বয়সে যে আবার ফ্রন্টে চললে, হাড় ক'খানা নিয়ে ফিরতে পারবে তো ?"

"হাড় কখানা জুড়িয়ে গেলেই ভালো হয় ভাই, আর লড়াই করার ধৈর্য নেই। সাতটা ছেলে মেয়ে জন্মেছে—তিনটি মেয়ে বিয়ের যোগ্যা হয়ে উঠলো। একটু ক্লিষ্ট হেসে ডাক্তার গাঙ্গুলি বললেন, "সংসারে সমাজে ভাই তোমার প্রতিপত্তি রয়েছে, জনপ্রিয়তা রয়েছে, ত্যাগ দিয়ে আর প্রেম দিয়ে তুমি গ্রামের মানুষের মনে শ্রদ্ধার আসন পেতে নিয়েছ। আমাদের সে ধৈর্য নেই, শক্তি নেই। মর-জগতের মানুষ আমরা সম্মানে পেট ভরে না। অর্থের দাবী জানালেই অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। দেখবে ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলি হয়ে ফিরে আসব যখন ক্যাপ্টেনের পাদোদক খেতে কেউ কুণ্ঠিত হবে না।"

সবিতৃ বললেন, "তাই বলে ক্যাপ্টেনকে নির্মম শোষক যন্ত্র করে রোগীর হাড়মাসগুলো কুরে কুরে খেওনা।"

হেসে উঠলেন ডাক্তার গাঙ্গুলি। "তুমি জানো না এক শ্রেণীর মানুষ আছে ডাক্তারকে ফাঁকি দেয়, তুমি ধন্য এই দরিদ্র গ্রামে, পয়সার উপার্জ্জনের সঙ্গে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছ।"

"ধন্য কিনা জানিনে ভাই, তবে এই অজ্ঞ আর অশিক্ষিত নীচু-তলার মানুষরা যে স্বাস্থ্যের ভালো মন্দ উপলব্ধি করেছে, চিকিৎসা-শাস্ত্রকে বিশ্বাস করেছে, তার জন্যে সত্যিই গৌরব অনুভব করি। যদি কিছু হয় তবে এদের দিয়েই শেষ পর্যন্ত কিছু হবে গাঙ্গুলি।"

শ্লেষের কণ্ঠে ডাক্তার গাঙ্গুলি বললেন, "তমসাবৃত নিশীথ আকাশে সূর্য ওঠার স্বপ্ন ভাই। সুদূর পরাহত। জান একদিন ঝড় উঠবে, সে তুমুল কাণ্ড, তারপর দেখবে ভোর হয়ে আসছে। সে আরেক নতুন দিন।"

সবিতৃ চার্জ বুঝে নিয়ে ডাক্তার গাঙ্গুলিকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এল। কোয়ার্টারে এসে দেখলেন একটি লোক তাঁরই প্রত্যাশায় বারান্দায় বসে রয়েছে।

"একি, রজনী তুমি! ইষ্টিসানে ধীরু, গোবিন্দ, কেতাব গিয়েছিল, ওদের তো বলেছি বিকেলে যাব।"

রজনী নিরুত্তর।

ওর ক্ষেতে সবে তখন রং ধরে এসেছিল সোনার ফসলে, তার আগেই ছেলে মেয়ে দুটি অনাহারে মরলো। পঞ্চাশএর মন্বন্তর ওর সর্বস্ব গ্রাস করে নিল। একটু ভিটে-মাটি, রোগ-জর্জর বৌ, আর একটা মাত্র গরু এখনও সম্বল রয়েছে। এদিককার অঞ্চলের গ্রাম্য মানুষ বর্মনরা স্বভাবতই দেখতে সুশ্রী। দুর্ভিক্ষ পীড়িত শীর্ণ চেহারায় রজনীর অতীত মুখশ্রীর ছাপ-টুকু লেগে রয়েছে। বয়স চল্লিশ কি পঞ্চাশ বোঝবার উপায় নেই। যেন একটা কঙ্কাল!

হঠাৎ বেদনার আর্তনাদে রজনী যেন বোমার মত ফেটে পড়লো। "বাবু দুর্ভিক্ষে আমার সবই শেষ হয়ে গিয়েছে। তুমি তো জানোই, বউটাকেও কী বাঁচাতে পারবো না? চৌদ্দ বৎসরের মেয়ে ভাতের দুঃখে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।"

সবিতৃ ডাক্তার চমকে উঠলেন। মাস ছয়েক আগে তিনি এই অঞ্চলে রিলিফ করতে এসেছিলেন। তখন রজনীর স্ত্রীকে চিকিৎসা করেছিলেন। উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "রজনী, তোমার স্ত্রী কি এখনও ভালো হয়নি? যে ওষুধটা আমি লিখে দিয়ে গেছলুম?"

রজনী বললো, "জানেন তো বাবু, বাজারে সে ওষুধ পাবার জো নেই, ঘরের শেষ সম্বল টিনখানা বেচে অনেক কষ্টে যদি বা কালো-বাজারে ঔষুধ জোগাড় করলুম, একেকবার ফুঁড়তে ডাক্তার দু-টাকা ফি চায়, কোথায় পাবো বলুন?"

সবিতৃ নিরুত্তর। একজনের গোলায় ধান পচে নষ্ট হচ্ছে আর একজন খেতে পাচ্ছে না, একজনের ব্যাঙ্কে টাকার স্তূপ জমছে আর এক জনের রুগ্না স্ত্রী সামান্য কটা টাকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে।

"বাবু", রজনী আবার ডাকলো, "বাবু যাবেন একবার আমার বৌটাকে দেখতে।"

"এই যে চলো যাই।" পরিশ্রান্ত সবিতৃ ক্লান্ত মন্থর পায়ে রজনীকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল পথে। ধূ ধূ করছে মাঠ, আর রিক্ত খামার। খাঁ খাঁ করছে। জনমানব শূন্য। দুই ধারে খাল বিল ডোবা রেখে সবিতৃ হাঁটতে লাগলেন। একটা প্রকাণ্ড অনুর্বর মাঠ আর কিছু পরিত্যক্ত জমি দেখিয়ে রজনী বললো, "এই গ্রামের দিকে চেয়ে দেখ বাবু চিনতে পারো? একটি পরিবারের চিহ্ন নেই। ওই ডোবার ধারে শ্যাল-শকুনে মড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি করে খেয়েছে। ওই ভিটখানাতে বউএর মুখের ভাত স্বামী লুটে নিয়ে গিলেছে।"

আরও এগিয়ে যেতে লাগলেন সবিতৃ। দূরে দূরে দেখা যায় তিস্তার শীর্ণ রেখা। জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে জেলে পল্লী ছিল না রজনী? কেষ্ট উমাপদ ওরা কী কেউ বেঁচে নেই।"

"কাচ্চা বাচ্ছাগুলো একে একে মরতে সুরু করলো, জালের সুতো পেলনা, নৌকা পেলনা, জলের দরে জমিজমা বেচে দিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল।" একটু গলার স্বর নামিয়ে রজনী বললো, 'লালুমিঞা, বিভূতি দাসকে চেন তো বাবু? জমিগুলো লুফে নিয়েছে। বিঘের পর বিঘে ওই তামাক বন সব ওদের। একেবারে লাল হয়ে গিয়েছে। এবছর আবার মিলিটারি কন্ট্র্যাক্ট পেয়েছে।"

"চাল কত ষ্টক্ করেছিল?" ডাক্তার বেদনায় কেঁপে উঠলো।

"সে কি শুধু এখানে বাবু, কত জায়গায় যে গোলাবাড়ী করেছে ? একটা জেলা পেট পুরে খেতে পারে ? তবু ওদের আশা, আরও দর উঠবে।"

সবিতৃ বললেন, "মানুষের, বুকফাটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আর অশ্রুজল ওরা জমা করে রেখেছে।"

আরও কি মাঠ ঘাট পার হয়ে সবিতৃ পৌছুলেন এবার রজনীদের গ্রামে। এ গ্রামের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তিনি ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। কত বীভৎস মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়েছে ডাক্তারকে। অনাহারে মৃত্যু। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে মৃত্যু, পরিবারের মুখে অন্ন না দিতে পেরে অনুশোচনায় অপমৃত্যু। পঞ্চাশের মৃত্যুর খতিয়ানের সঙ্গে তাঁকে পরিচিত হতে হয়েছে।

রজনী বললো, "সত্যি বাবু গাছের পাতা সেদ্ধ করে মানুষ খেয়েছে, গাছের ডালে গলায় ফাঁসি দিয়ে মানুষ মরেছিল, পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল।"

রজনীর ঘরে ঢুকে থমকে যাওয়া মনটাকে আয়ত্ত করে নিলেন সবিতৃ। কালো-বাজারে ওষুধ কিনতে শেষসম্বল মাথা গোঁজবার টিন কখানাও সে খুইয়েছে।

কয়েকটি কলা গাছ ঘেরা উঠোনের একদিকে মুখ থুবড়ে রয়েছে যেন চালা ঘরখানা। দাওয়ায় বাঁধা হাড়-জিরজিরে একটা মেটে গরু। ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে রজনী বললো, "বাবু এ গাইটা সাক্ষাৎ ভগবতী। ঠিকেদার যখন গাঁ উজাড় করে গাই বলদ সব নিয়ে গেল, আমার এ জবা কিছুতেই গেলনা, টিঁসিয়ে মানুষগুলোকে একসা করে দিল।"

"তা এ ভাবে দারিদ্র্যকে না বাড়িয়ে তার চেয়ে কশাইএর হাতে ওকে সঁপে দেওয়া যে ভালো ছিল রজনী।" সবিতৃ বললেন, "এক কৌটা দুধ দেবারও যখন আর তার অধিকার নেই।"

ফিস ফিস করে রঞ্জনী বললো, "এবার আমার গাইটা বাবু গাভীন্ হতে পেরেছে, ষাঁড় তো মিলিটারিকে জোগাতে জোগাতেই শেষ হয়ে গেল। হাজার টাকা পর্যন্ত দর উঠেছিল। আমি সেই—ডেয়ারী ফার্ম না কী বলে, বড় লাটসাহেব ষাঁড় দিয়েছিল, ছ' কোশ গাই টেনে নিয়ে গেছলুম, জবা মস্ত বাছুর দেবে বাবু।" শীর্ণ মুখে রঞ্জনীর আশার বিদ্যুৎ চম্‌কালো।

"যাক্ তোমার গাইএর তবু একটা ব্যবস্থা হয়েছে।" সবিতৃ বললো, "আমার এক বন্ধুর এক গাই তিন মাস হাম্বা হাম্বা করে অবশেষে ঝিমিয়ে পড়লো।"

রঞ্জনীর বৌএর অঙ্গে ক্ষয় রোগ। আরও নানা উপসর্গ রয়েছে। শত ছিন্ন একখানা মাদুরে শুয়ে, ঠিক যেন চাঁচা ছোলা একখানা কঞ্চি, দেহের আব্রু বল্‌তে এক টুক্‌রো ন্যাকড়া। রঞ্জনী ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে খানকয়েক কলাপাতার একটি আবরণ বৌএর সর্ব্বাঙ্গে ঢেকে দিয়ে বললো, "বাবু এ দেশে আর জল ঝড়ের বিরাম নেই। কালো-বাজারের কাপড়ের দিকে তাকানোর সাধ্য কার।"

ডাক্তার রোগিনীর পাশে উবু হয়ে বসে বুকে স্টেথস্‌কোপ্ লাগালেন। একটু নড়ে চড়ে আব্রুটাকে একটু সংযত করে নিয়ে দুর্বল কণ্ঠে বললো, "কে? ডাক্তারবাবু! বাবু আর বাঁচাবেন না—ভাতের জন্যে যুদ্ধ করতে করতে আবার কাপড়ের জন্যে যুদ্ধ। লজ্জা নিবারণ করবারও আর উপায়ও নাই।"

হাঁফিয়ে উঠেছিল রঞ্জনীর স্ত্রী। শান্তির একটি নিঃশ্বাস ফেলে থেমে গেল ও। অবস্থা প্রায় শেষ। ডাক্তার কী আর চিকিৎসা করবেন? ছোট্ট ঘর, জানালা তো দূরের কথা—কোথাও এতটুকু ছিদ্র নেই। একদিকে থুথু জমেছে। মলমূত্র মেশানো একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ—দাওয়ায়

গোবরে মাছি ভন্‌তন্‌ করছে। বাইরে বেরিয়ে এসে সবিতৃ বললেন, "দেখি তোমার যে ওষুধটা কেনা আছে।"

রজনী উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "বাবু ভালো হবে তো ?" উঠোনে জরাজীর্ণ এক মাচাতে ব্যাগটা রেখে সিরিঞ্জে ওষুধ ভর্‌তে ভর্‌তে সবিতৃ বললেন, "ওষধু যদি কাজ করবার সময় পায় তবে হয়তো ভাল হয়ে উঠতে পারে, রজনী।"

তিন

ডাঃ সবিতৃ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন পরদিন বেলা বারোটায়। বাইসিকলে তিন চারখানা গ্রামে যেয়ে, দশ-বারোজন রোগী পরিদর্শন করে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে লাবণ্যর একখানা চিঠি পেলেন।

তাঁদের গ্রামে লাবণ্যর মামার বাড়ী। আশৈশব মাতৃহারা লাবণ্য পণ্ডিত-প্রবর শ্যামনাথ বিদ্যাভূষণ মাতুলের কাছেই মানুষ হয়েছিল, লেখাপড়া শিখেছিল। এই সময় সবিতৃর সঙ্গে ওর বিবাহের কথা-বার্তা হয়, কিন্তু ওঁর পিতার মোটা অঙ্কের পণের দাবী পূরণ করবার মত ক্ষমতা লাবণ্যর মাতুলের ছিল না।

পাশের গ্রামের একটি সেবক ছেলে বিদ্যুৎ লাহিড়ী লাবণ্যকে বিয়ে করে তার মাতুলকে ভারমুক্ত করেছিল।

বিদ্যুৎও রেলে চাকরী করে। গেটম্যান।

ওদের মহকুমা কংগ্রেস কমিটির ও সভ্য ছিল, প্রধান কর্মী ছিল, টাকার অভাবে চেষ্টা দিয়েও ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।

সংসারে একমাত্র বৈমাত্রেয় অগ্রজ ছাড়া কেউ ছিল না। তাই পণের কোনও প্রশ্ন ওঠেনি বলে লাবণ্যকে বিয়ে করবার কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতি আর হতে পারেনি।

কিন্তু জীবন ধারণ করতে ওকে সরকারী চাকুরীর ফাঁদে পা দিতে হয়েছিল, কংগ্রেসের সভ্য পদ থেকে সরে এলেও মানুষের মুক্তি আর কল্যাণ ওর অন্তরের দুর্বার কামনা হয়ে রইল।

মাইল দুএক দূরে অম্লদানগর ও পীরগাছা ষ্টেশনের মধ্যে ওর গেট। ওর বৎসর তিনেক মেয়েটির অসুখ। মেয়েটি চিররুগ্না।

লাবণ্য লিখেছে, দাদা, খবর পেলুম তুমি এখানে বদ্‌ল হয়ে এসেছ? আমরাও মাস দুই হোল এসেছি। সুবিধে মত একবার এসে আমার মেয়েটাকে দেখো। জন্ম থেকেই ও ভুগছে, বৎসর তিনেক বয়স হয়েছে, নড়তে চড়তে পারে না। কালো বাজারে ওষুধ কিনে পঙ্গু মেয়েকে সুস্থ করবার আমাদের সাধ্য কী বলো? যুদ্ধের বণ্ডে সই করে আঠারো টাকা থেকে মাইনে উঠেছে পঁয়ত্রিশে। কিন্তু বাজারে যে আগুন ধরেছে।

"বাবু, ও বাবু, আমার ওষুধটা দিয়ে দেন, বাবু আমি হাল ছা'ড়ি আইচি।"

চিঠি পড়বারও উপায় নেই ডাক্তার সবিতৃর। ইতিমধ্যে দশবারোজন গ্রাম্য মানুষ শিশি হাতে উপস্থিত। সবারই দাবী আগে ওষুধ চাই। যেন এক ঢোক ঔষধ গিল্‌তে পারলেই ওরা মুহূর্তে রোগ-মুক্ত হয়ে যাবে।

সেদিন সবিতৃর যৌবনের রঙিন চোখে লাবণ্যকে ভালো লেগেছিল। সে মধুর ভালো লাগা বিস্মৃত হবার নয়। লাবণ্য আজ পরস্ত্রী। সবিতৃর সে প্রাণের মদিরতায় স্নেহের মঞ্জুষা এসে মিশেছে।

সন্ধ্যেবেলার শেফালী ফুলের গন্ধ সবিতৃর মনকে ক্ষণকালের জন্যে আনমনা করেছিল। এরই নাম বুঝি স্মৃতির ঔদাসীন্য। মাঝে মাঝে স্মরণের উপকূলে মন থম্‌কে থেমে যায়।

পরমুহূর্তেই তিনি চরিত্রের নির্মম দৃঢ়তায় মনকে সংযত করে নিলেন। জীবন-বৈরাগ্য তাঁর প্রাণের উপকূলে উচ্ছল ঢেউ তুললো। লাবণ্যর চিঠিখানা ভাঁজ করতে করতে তিনি শ্রান্ত দৃষ্টি মেলে লোকগুলোর দিকে তাকালেন। নৈরাশ্যের দৃষ্টিতে তাকালেন

নিজের ঔষধের শিশিপত্রগুলির দিকে। গ্রাম্য মানুষগুলো চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশ্বাসী হয়েছে, জেগে উঠেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের উপযুক্ত ঔষধ আজ কোথায়? মুমূর্ষু রোগীকুলকে সুস্থ করে তোলবার ক্ষমতা যে কালো-বাজারের অন্ধকারেই পথ হারিয়েছে। এই সময় রিলিভিং ষ্টেশন মাষ্টার ঘরে এসে ঢুকলো। কালো রঙের বেঁটে চেহারা, মাঝারী গোছের বয়স। লুব্ধ প্রত্যাশায় চোখের মনি দুটি সবসময় যেন কিসের সন্ধানে চক্‌চক্‌ করে। চোখের পাতা ঘন ঘন নামে ওঠে। সমগ্র পৃথিবী যেন ওর। মৃত্তিকায় একটু মাটি পড়লে, গাছের একটি পাতা খস্‌লে ও নিবিড় বেদনা অনুভব করে। গায়ে একটি গরদের আধময়লা চাদর জড়ানো রয়েছে।

সবিতৃ ওকে আপ্যায়ন জানিয়ে বললেন, "আসুন নন্দীমশাই, ভালো আছেন তো? এখানে বুঝি বদ্‌লি হয়ে এলেন?"

নন্দীমশাইর কণ্ঠস্বরেও একটু আবরণ ছিল, একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। জোরে কথা বলতেন না, শুধু একটা ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ। কি যেন গোপন করতে সব সময় সংযত আর সতর্ক।

ফোলা গালদুটি আরও ফুলিয়ে উজ্জ্বল হেসে ফিস্‌ফিসিয়ে নন্দী বললো, "জানেন না ডাক্তারবাবু, আমার উন্নতি হয়েছে, ইষ্টিশান মাষ্টার, এখন রিলিভিং পিরিয়ড, এখানেই হেড কোয়ার্টার করেছি।"

"জানি মাষ্টারমশাই আপনার পদোন্নতি হয়েছে. আপনি ষ্টেশন মাষ্টার হয়েছেন," কঠিন কণ্ঠে সবিতৃ বললেন, "একই যাত্রায় পৃথক ফল, আপনার সহকর্মী প্রতুল লাহিড়ী সম্মান রক্ষা করতে আত্মহত্যা করেছেন।"

ফিস্‌ফিসিয়ে নন্দী বললো, "খবরটা যে জানাজানি হয়ে গেল।"

"আপনিই তো খবরটা ডি-টি-এস্‌কে জানিয়ে দিয়েছিলেন।"

"না জানিয়ে যে উপায় ছিল না, লাহিড়ীর চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। একখানা মালগাড়ী দেবে একশত টাকা।"

"অন্যায় তাঁর স্বীকার করি, জিনিষপত্রের দুর্মূল্য যে একাংশে দায়ী তাও অস্বীকার করবার নয়, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি এই দুর্নীতি আর অন্যায়ের ইন্দ্রজাল রচনা করেছে কে? মানুষ যদি পেট ভরে খেতে পায় কেন সে নীতিভ্রষ্ট হবে?"

নন্দী জিজ্ঞেস করলো, "আপনি বলেন তবে রেলকে ফাঁকি দেওয়াই রেল-কর্ম্মীদের কর্তব্য?"

"আমি কাউকে ফাঁকি দিতে বলিনা নন্দীমশাই," স্বভাবসুলভ প্রশান্ত হয়ে সবিতৃ বললেন, "আমি বলি চাকরী করে যার পেট না ভরবে, সে রিক্সা টানুক, আর কিছু না হোক জীবনের মান তো নামিয়ে দিতে পারবে, রিক্সাওআলাকে ষড়যন্ত্র করে কেউ অপমানও করবার উৎসাহ পাবে না।"

নন্দী বললো, "মাড়োয়ারী মহাজনরা অতিষ্ঠ হয়েছিল, তাই ওরা নোটের পিছনে ইনিসিয়াল করে রেখেছিল।"

সবিতৃ বললেন, "আপনার দাবী না হয় কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, তবু তিনি তো ছিলেন আপনার সহকর্মী।"

এবার হিংস্র বাঘের মত জলে উঠলো নন্দীর চোখের মণি, শ্লেষের কণ্ঠে বললে, "আমি কারও ক্ষতি করিনি ডাক্তারবাবু, মাত্র আত্মরক্ষা করেছি। প্রতুল লাহিড়ীর ছেলের জন্যে টালিক্লার্কের চাকরীও জোগাড় করেছিলুম।"

"কিন্তু মুকুট সে চাকরীতে ইস্তফা দিয়েছে।" ডাক্তারের অসম্পূর্ণ কথার মধ্যেই নন্দী আবার বিদ্রূপের কণ্ঠে বললো, "ইস্তফা দেবে না? তার মায়ের কত বড় আশা, কিন্তু কপালে ঘি নেই—ঠকঠকালে হবে কী? ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করে রংপুর কলেজে পড়ছিল, যুদ্ধ বেধে গেল, শুধু সৈন্য আর রসদ বোঝাই গাড়ী চলবে, প্যাসেঞ্জার-ট্রেন উঠে গেল, সব আশা ফুরোলো।"

"আশা তার এখনও ফুরোয়নি নন্দীমশাই, য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রী না

থাক সে, মুকুট ষ্টেশনে যে হোটেল দিয়েছে, তা শুধু ওর আর্থিক জীবনকেই পুষ্ট করেনি, আঠারো বছরের বাঙালীর ছেলে দুরন্ত ঝড়ের সামনাসামনি হয়ে চাকুরীজীবনকে হেলা করে যে নির্ভীক চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে, তা ওর বাপের অপমানের কলঙ্ককে মুছে দেয়নি, বাঙ্গালী জীবনকে সম্মানিত করেছে।" ডাক্তারের চোখের মনি দুটো গৌরবে চকচক করে উঠলো, পর মুহূর্তেই জ্বলে উঠলো আগুনের ফুলকির মত। "তবু আপনাদের কুচক্র ওর উপর প্রতিশোধ নিতে ক্ষান্ত হয়নি, ওকে ডুবিয়ে দিতে আপনারা পরেশ ময়রার সঙ্গে সহযোগিতা করেন।"

ডাক্তারের এই কঠোর মন্তব্য হয়তো শুনতে পেলো—হয়তো শুনতে পেলনা নন্দী। সে তখন তন্ময় হয়ে ডাক্তার যে আট দশ শিশি ওষুধ তৈরী করছিলেন সেই দিকে দেখছিল। ওর চোখের লোভাতুর মণি আরও লোলুপ হয়ে উঠলো। কি যেন অপহৃত হয়ে যাচ্ছে ওর পৃথিবী থেকে, অসহ্য অব্যক্ত দীর্ঘ নিশ্বাস বুকে চেপে রেখে বলে উঠলো, "ডাক্তারবাবু আপনি লাকিম্যান, আপনার কত রোগী পত্র!"

"লাকিম্যান," সশব্দে সবিতৃ হেসে উঠলেন, "আমার কত দুর্ভাগ্য যে এই সব হতভাগাদের চিকিৎসার ভার আমার হাতে নিতে হয়েছে, "ওষুধ নেই, পথ্য নেই, জীবনীশক্তির আর অস্তিত্ব নেই। যে বুকে নল বসাই, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে একেবারে ফোঁপড়া হয়ে গিয়েছে। ঘরে ঘরে ক্ষয় আর যক্ষ্মা রোগ, থুকথুকে কাসি আর চাপ রক্ত, এরাই আমাদের স্বাস্থ্য। এই হচ্ছে যুদ্ধের আশীর্ব্বাদ।"

"ধরে নিন অদৃষ্ট ডাক্তারবাবু," নন্দী বললো, "রুগীগুলোকে সারাতে না পারলে একেবারে হাতছাড়া করে দেবেন না, একটা হোমিওপ্যাথিক বাক্স রেখেছি কিনা।"

নিরুত্তর ডাক্তার একটিও কথা বলতে পারলেন না, আম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন নন্দীর অপসৃয়মান মূর্তির দিকে।

চার

দিন কয়েক পরে সবিতৃ বিদ্যুতের কোয়ার্টারের দিকে রওনা হয়ে পড়লেন। নিরিবিলি নির্জন পথ। টুকরো টুকরো চিন্তা এসে ভিড় করে মনে।

দেশসেবা, স্বদেশ সাধনা! সম্প্রতি বার্ণাড শ বলেছেন, জীবনী-শক্তিকে বাড়াতে না পারলে রাজনীতির কোনও মূল্য থাকেনা, যে দেশে অল্প বয়সে মৃত্যুর হার এত বেশী সে দেশে রাজনীতির কী কোনও মূল্য আছে?

একদিকে জাপানের পরাজয়ে সম্রাট হিরোহিটোর মর্মস্পর্শী ভাষণ, আর এক দিকে বিলাতে শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের ভোটাধিক্যে জয়লাভ, য়্যামেরিকায় বিজয়লক্ষ্মীর চাঞ্চল্যকর বক্তৃতা, পৃথিবী কী সত্যই আজ গণতান্ত্রিক হয়ে উঠবে? না, গণতন্ত্রের মুখোস এঁটে ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তেরই ব্যূহ রচনা করবে।

দুই ষ্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে রেললাইন আর বোর্ডের রাস্তার শেষে গেটম্যান বিদ্যুতের কোয়ার্টার। একটি ছোট্ট খুপরি আর একটু দাওয়া, স্ত্রীর আব্রু রক্ষা করতে বিদ্যুৎ একটু জমি বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়েছে। পায়খানাও নিজের খরচে তৈরী করতে হয়েছে।

এইটুকুই হয়তো গেটম্যানের যোগ্য পাওনা। ট্রেনের আনাগোনার সময় যে গেট খুলবে আর বন্ধ করবে, নীল লাল পাখা ওড়াবে আর বাতি ঘোরাবে তার পক্ষে বিয়ে করে সংসারী হওয়া নিশ্চয়ই খুব যুক্তি-

সঙ্গত নয়। চব্বিশ বছরের পাটকাঠির মত শীর্ণ মেয়ে লাবণ্য, সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে যে গোবর সংগ্রহ করে আনে তাই দিয়ে জ্বালানী তৈরী করছিল। আটপৌরে শাড়ী ওর বহুদিন গত হয়েছে, সেমিজের উপর একখানা গামছা জড়িয়ে রেখেছিল। ওর বছর তিনেকের পঙ্গু মেয়েটির মেরুদণ্ড সুগঠিত হয়নি, সরু লিকলিকে হাত-পা, ফর্সা রং, টানা টানা চোখ, হাঁটতে পারেনা, বসতে পারেনা, মনে হয় যেন ছ'মাসের বেশী বয়স হয়নি। শুয়ে শুয়ে অনর্গল কণ্ঠে ছড়া কাটে :

আমি ভালো হয়ে হাঁটবো,
দুধ খেয়ে মোটা হব,
বাটী ভরা দুধ খাব,
বোতল ভরা ওষুধ খাব।

এমনই আবোল তাবোল বকতে বকতে শ্রান্তি এলে ও ঘুমিয়ে পড়ে। একাধিক্রমে শুয়ে থাকতে থাকতে পিঠে ব্যথা অনুভব করে, বিদ্যুৎ সময় পেলেই ওকে কোলে করে বাইরে নিয়ে যায়। বিদ্যুৎ এখন কোথায় যেন বেরিয়েছে, ওর খুকী ঘুমুচ্ছে।

সবিতৃর সাইকেলের বেল শুনতে পেল লাবণ্য—পরিচিত শব্দ; কিশোরীকালের কানের পর্দায় যেন এ ঘণ্টা বাঁধা রয়েছে। খুশিতে লাবণ্যর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। পুরোনো একখানা সৌখীন শাড়ী পরে নিয়ে ও দরজা খুলে দিল।

বাইরের দেওয়ালে সাইকেলটা হেলান দিয়ে রেখে মাথা হেঁট করে সবিতৃ ভেতরে ঢুকলেন। হাসিমুখে বললেন, "কী রে কেমন আছিস? বড্ড যে রোগা হয়ে গেছিস?"

লাবণ্য ওর স্বভাবসুলভ একটু প্রাণখোলা হাসি হাসলো। "এই কন্ট্রোলের দিনে তুমি কী আরও মোটা হতে বলো নাকি?

খাবার দিতে পারবে?" ও দাওয়ায় একখানা পিঁড়ি পেতে দিয়ে বললো, "বসো শ্রীরামচন্দ্র ..."

লাবণ্যর এই সম্ভাষণে মুহূর্তের জন্যে আন্মনা হয়ে গেলেন সবিতৃ। নিজেকে সংযত করে নিয়ে অনুযোগের কণ্ঠে বললেন, "তুই এখনও আমাকে বুঝলিনারে লাবু, তাই রামচন্দ্র বলে ডাকিস, আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক দিকটার এমন অসাম্য ব্যবস্থা যে আমাদের ঘরের ছেলেদের পিতৃভক্ত না হয়ে উপায় নেই। তোকে বিয়ে করলে আমি আন্তরিক সুখী হতুম, কিন্তু নিজের সুখের চিন্তার সুযোগ কই। আমি বিয়ে করলুম, আমার পণের টাকায় বাবা দুটি কন্যার দায় থেকে মুক্ত হলেন, এখনও দুটি বোন বাকী।"

"আর নয় দাদা, ও দুটি বোনকে লেখাপড়া শেখাও, ওরা যেন স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে," লাবণ্য বললো, "পিতৃভক্তির এ প্রহসন বরদাস্ত করা যায়না।"

"স্বাবলম্বী হতে হবে মেয়েদের, বিয়েও করতে হবে," সবিতৃ বললেন, "কোনও দিককেই অস্বীকার করা চলবেনা। তাই সমাজের আমূল সংস্কার চাই, মানুষের উদারতা, ত্যাগ, প্রেম ও মৈত্রীর মধ্যে দিয়েই পণপ্রথাও একদিন তলিয়ে যাবে।"

লাবণ্য আর কী উত্তর দেবে? মাথা নীচু করে উনুনে পাটকাঠি ধরাতে লাগলো।

সবিতৃ মিলিটারী ইউনিফর্ম পরেছিলেন। গরমের জ্বালায় কোটটা খুলে ফেললেন। উনুনে চাএর জল বসিয়ে লাবণ্য তাঁর হাত থেকে কোটটা নিয়ে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখলো। কমিশনের স্টারগুলি দেখতে দেখতে বললো, "তোমাদের বেশ সুন্দর কোট দিয়েছে, না দাদা? V. C. O. র‍্যাঙ্ক বুঝি তোমার? আর কী দিয়েছে?" ও পাখা নিয়ে এবার সবিতৃকে বাতাস করতে লাগলো। সবিতৃ কিছুক্ষণ লাবণ্যর

মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "দিয়েছে বলিস্‌নেরে, কানে যেন কে গরম শীষে ঢেলে দেয়, ইংরাজের সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে ওদের বণ্ডে সই করে এগুলো আমাদের পেতে হয়েছে, বিপদের সময় ইংরেজকে ফেলে পালাবনা। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিবারবর্গকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি, তা নাহলে তারাও যে না খেয়ে মরতো।"

লাবণ্য জিজ্ঞেস করলো, "বউদিও কী দেশে থাকে দাদা?"

"এ দুর্দিনে আর তোর বউদিকে বহন করবার দায়িত্ব আমার ছিলনা রে. বাবাকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত করতে বউ এনে দিয়েছিলুম। অনেক আগেই সে আমাকে মুক্তি দিয়েছে।"

চমকে উঠলো লাবণ্য, মুহূর্তে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কী বললে দাদা? বউদি নেই?"

"দু-বছর বেঁচেছিল. দশদিন আমি তাকে দেখেছিলুম," সবিতৃ বললেন, "কর্মস্থলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলুম, পারিনি; বিছানায় শুয়ে শুয়ে কোঁকাতো, ছুটি চেয়েছিলুম চেঞ্জে নিয়ে যাব, কিন্তু পাইনি। বাবা দুঃখ করে বললেন তারা ঠকিয়ে অন্য মেয়ে দেখিয়েছিল। যাক তাঁরাও কন্যাদায় থেকে মুক্ত হয়েছেন, আমার বাবাও উদ্ধার হয়েছেন।"

বিচলিত লাবণ্য প্রতিবাদের কণ্ঠে বললো, "তুমি আবার বিয়ে কর দাদা।"

সশব্দে হেসে উঠলেন সবিতৃ, "আবার বিয়ে? মানুষ একবারই বিয়ে করেরে।"

পরমুহূর্তে ডাক্তার আনমনা হয়ে যান। একটু পরে বললেন, "তোর রুণুকে মনে আছে রে লাবু? রমেশ কাকার মেয়ে. বর নাকি আজও তার পাওয়া যায়নি, এম-এ ও তো পাশ করে ফেললো।"

"বর আর তেমন করে ওবা খুঁজলো কই দাদা," লাবণ্য বললো, "রমেশ কাকা তোমার ওপর এখনও আশা রাখে, তাছাড়া রুণুদি।"

"থাম তুই," ডাক্তার ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "বিয়ে মানুষ একবারই করে।"

লাবণ্য বললো, "কিন্তু মহাভারতের যুগ থেকে সুরু করে দেখা যায়, পুরুষ বিয়ে করে বারবার; সময়ের পরিবর্ত্তনে একাধিক বিয়ে যদি না করে, একাধিক নারীকে আপন প্রেমের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, এইটেই হচ্ছে পুরুষের স্বভাবসুলভ ধর্ম।"

"পুরুষের স্বভাবধর্মের আর এক দিকও দেখতে ভুলিসনে লাবু," সবিতৃ বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বীর সুভাষের দেশের ছেলে আমরা। ত্যাগের তপস্যাতেই নারীকে শ্রদ্ধা সম্মান জানাতে জানি।"

লাবণ্য কিছুক্ষণ আত্মবিহ্বলের মত সবিতৃর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সে বললো, "তোমাদের ওই স্বভাব-মাধুর্য যে মেয়েদের মুগ্ধ করে, তারা ভালোবেসে ফেলে তোমাদের।"

"তাই বুঝি তুই আমাকে ভালোবেসেছিলি।" সবিতৃ উজ্জ্বল চোখে ওর দিকে তাকালেন।

"ভালোবাসতুম নয় দাদা, এখনও বাসি; আকাশের নীলিমাকে, চাঁদকে যেমন বাসি, ঠিক তেমনি তোমাকেও ভালোবাসি।"

"Good," আবেগ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সবিতৃ বললেন, "তুই নিশ্চিন্ত থাক, তোর মতই আমাকে সব মেয়ে ভালোবাসেরে। সে ক্ষমতা, সে সাধনা আমার আছে।"

এই সময় লাবণ্যর খুকী মিহি কণ্ঠে চিঁ-চিঁ করে কেঁদে উঠলো, লাবণ্য বললো, "ওই আমার মেয়ে উঠলো, তুমি দেখো দাদা।"

লাবণ্য চা তৈরী করতে লাগল।

বছর তিনেকের মেয়ে, ফর্সা রং, টানা টানা চোখ, সরু লিকলিকে

হাত পা, সবিতু ওর কান্না থামিয়ে বললেন, "আমাকে চিনতে পারো খুকু? আমি কে বলতো?"

ডাক্তার এবং স্টেথস্কোপ দেখলেই খুকীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আধো আধো ভাষায় বললো, "তুমি ডাক্তার মামা, মা বলেছিল তুমি আসবে। মামা আমি কবে ভালো হয়ে উঠবো বলতো? আমার একটুও শুয়ে থাকতে ভালো লাগেনা।"

"এইতো এইবার ভালো হয়ে উঠবে।"

ডাক্তার ওর বুকে স্টেথস্কোপ লাগিয়ে ভাবতে লাগলেন, এই কচি মেয়ের কী তীক্ষ্ণ অনুভূতি, ভালো হয়ে উঠবার কী ব্যগ্র ব্যাকুলতা, কিন্তু ডাক্তার পকেটে স্টেথস্কোপ রেখে ভাবতে লাগলেন।

লাবণ্য জিজ্ঞেস করলো, "কী দেখলে দাদা?"

"রিকেট," ডাক্তার বললেন, "ভিটামিনের অভাবে বাচ্চাদের এই রোগ হয়।"

লাবণ্য বলল, "জীর্ণ স্বাস্থ্য নিয়েই মেয়ে ভূমিষ্ঠ হ'ল, আমি মা—বলতে লজ্জা নেই, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ঘি দুধ তো দূরের কথা একটুকরো মাছ পর্যন্ত পাইনি। আঁতুড়েও তথৈবচ অবস্থা। দেখতে দেখতে বুকের দুধ শুকিয়ে গেল। বাজার তো দুধ-শূন্য, গরু-শূন্য; যা থাকে ময়রা আর বড় লোকের জন্যে। আমি মেয়েকে ভাতের ফ্যান আর বার্লি খাইয়ে এমনি পঙ্গু করে বাঁচিয়ে রাখলুম।"

প্রেসক্রপসন লিখে দিয়ে সবিতু বললেন, "এই তো হয়, এই-ই নিয়ম, কি করবি বল।"

প্রেসক্রপসনখানা আর পকেট থেকে খান পাঁচেক দশটাকার নোট লাবণ্যর হাতে দিয়ে সবিতু বললেন, "রংপুর সদর থেকে এই ওষুধগুলো আনিয়ে নিয়ে খুকীকে খাওয়াবি আর মাখাবি।"

"না-না দাদা, সে হয়না।" বাধা দিয়ে লাবণ্য বললো, "তুমি

এসে আমার মেয়েকে দেখলে এইতো আমার সৌভাগ্য, আবার কেন টাকা।"

"জানিসনে তুই, টাকা উপার্জনের সাফল্য তো এখানেই।" সবিতৃ বললেন, "লাইফ-ইনসিওরে কিছু টাকা পেলাম, আসার সময় পিওন দিয়ে গেল; শোন তোদের সাহেবের তো বাজার পাশ রয়েছে, একজন লাইন শ্রমিককে পাঠিয়ে আনিয়ে নিবি।"

লাবণ্য বললো, "তুমি যে দাদা আদর্শবাদের স্বপ্ন দেখতে দেখতে, সাম্যবাদের স্বপ্নেও বিভোর হয়ে উঠলে? রেলের বাজার পাশ রেলের হায়ার অফিসাররা পায়; ওদের রাজধানী, মহানগরী কিম্বা জেলা সদর থেকে বাজার করে খাবার অধিকার আছে; গরীব গেটম্যানের রুগ্ন মেয়ের ওষুধের জন্য বাজার পাশ নয়। সাহেব অত্যন্ত ডিসিপ্লিন রক্ষা করে চলেন, পাশের অপচয় বরদাস্ত করেন না।"

সবিতৃর জন্যে লাবণ্য কিছু মিষ্টি আনিয়ে রেখেছিল। কাঁসার বাটীতে কনডেন্সড্ মিল্কে তৈরী চা আর রেকাবে কয়েকটা মিষ্টি ও সবিতৃর সামনে রাখলো।

সবিতৃ কী যেন বলতে গিয়ে জলখাবারের দিকে চেয়ে থমকে গেলেন, গলার স্বরটা বুঝি আটকে গেল, এক দৃষ্টে শুধু তাকিয়ে রইলেন।

লাবণ্য বুঝে উঠতে পারেনি, তিনি চা না খাবার লক্ষ্য করছেন। "কনডেন্সড্ মিল্কে চা করেছি দাদা, মিলিটারী ট্রেনগুলো যখন এখান দিয়ে যেতো, মার্কিন সৈন্যগুলো জানালা দিয়ে যে কত কী ফেলতো, জ্যাম জেলি, সিগ্রেট চকোলেট, লজেন্স, কনডেন্স, আরও যে কত কী নামও জানিনা, হ্যাঁ দাদা য্যামেরিকানরা ইংরেজদের চেয়ে একটু ভালো, না? ভারতবাসীর ওপর একটা দরদ আছে।

সবিতৃ এ কথার কোনও উত্তর দিলেন না, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে

মিষ্টির ডিসটা দূরে সরিয়ে দিয়ে বললেন, "তুই মা হয়ে আমাকে ছুধের মিষ্টি খেতে দিয়েছিস? একী খাবার! এ যে বিষ! বাচ্চা শিশুর মুখের গ্রাস!"

লাবণ্য মুখ নীচু করে মিষ্টির ডিসটা সরিয়ে নিল।

কাঁসার গেলাসে চা। উত্তাপ কিছু বেশী। রুমালের সাহায্যে ধরে সেই ধূমান্বিত' চা-এ একটি চুমুক দিয়ে সবিতৃ আবার বললেন, "তোর কুড়িয়ে পাওয়া কনডেন্স মিল্কের চা আমি আনন্দের সঙ্গে খাচ্ছি, এ সেই আনন্দ বুঝলিবে, সেই সুখ, সেই স্বাচ্ছন্দ্য যা সব সময় স্নায়ুতে অনুভব করতে করতে দাসত্ব করি, দুশো বছর ধরে ভারতবর্ষে বাস করে আসছি, মার্কিনের দয়া জানিস অজ্ঞ ভারতীয়ের প্রতি অবজ্ঞা আর অনুকম্পারই দান।" বাকী চা-টুকু নিঃশেষে পান করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আজ যাই, সন্ধ্যে হয়ে এল, আবার আসবো তোর মেয়েকে দেখতে।"

কৃতজ্ঞতায় রুদ্ধকণ্ঠে লাবণ্য বললো, "তোমাকে আর কী বলবো দাদা। তোমার হাতেই আমার মেয়েকে তুলে দিলুম, কাল উনি ওষুধগুলো কিনে আনবেন। ট্রেন ভাড়া লাগবে! লাগুক। ছুটি দেবেনা? না দিক। রেজিষ্টার খাতায় এ্যাবসেন্ট হবে? হোক। র‍্যাশান য়্যালাউন্স কাটা যাবে? যাক। তবু তো আমার পঙ্গু মেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠবার একটু স্তিমিত আলোর সন্ধান পাবে।"

বাইরে বেরিয়েই সবিতৃ সম্মুখে বিদ্যুৎকে দেখতে পেলেন, সাতাশ আঠাশ বছরের যুবক, বলিষ্ঠ চেহারা, দেখতে সুশ্রী না হলেও বিদ্যুতের দীপ্তি যেন চোখের মণিতে নিরন্তর ঝকঝক করে।

শ্যামবর্ণের উজ্জ্বল মুখে স্মিত হেসে বললো, "দাদা আপনি এসেছেন? যাক মেয়েটার জন্যে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারলুম।"

সবিতৃ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথায় গেছলে বিদ্যুৎ?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে একটু যেন কুন্ঠিত ভাবেই বিদ্যুৎ বললো, "শ্রমিকবস্তিতে গেছলুম দাদা, ওদের উপর কী অত্যাচার? কী অবিচার, অন্যায় জুলুম। ওদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে অফ ডিউটিতে খাটিয়ে নেবে, পারিশ্রমিক তো দূরে থাক, দেহের ক্লান্তির জন্যে হাজিরা যাওয়া মানে একদিন অনাহারে থাকা।"

সবিতৃ বুঝতে পারলেন, সেবার সেই মহৎ প্রাণ আবার বিদ্যুতের মধ্যে জেগে উঠেছে। যে প্রাণের প্রেরণায় একদিন সে কংগ্রেসের সেবক হয়েছিল; গরীব ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত করেছিল।

মন্থর পায়ে সাইকেলে প্যাডল্ করতে করতে সবিতৃ বললেন, "দাসত্বর চাকায় তুমি যে বাঁধা বিদ্যুৎ, তোমার সেবাধর্ম যে নিষ্পেষিত হয়ে যাবে, কলমের একটি খোঁচায় তোমার চাকরী খতম্ হয়ে যাবে। কিন্তু এই দুর্দিনে তো তোমার পরিবার বাঁচিয়ে রাখতে হবে।"

বিদ্যুৎ নিরুত্তর। একটিও কথা বলতে পারলো না। সবিতৃর চলে যাওয়া পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ব্যথাতুর মন শুধু ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সবিতৃ সত্য কথাই বলেছেন। কিন্তু অন্যায় অত্যাচার যে সে মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না।

পাঁচ

লাবণ্যর বাড়ী থেকে বেরিয়ে আরও কয়েকটি রোগী দেখে সবিতৃ রেল লাইনের ধার দিয়ে কোয়ার্টারে ফিরছিলেন। সঙ্গে টর্চ-বাতি ছিলনা, নিষ্প্রভ ধূসর আলোয় চোখে কিছু দেখা যায় না। রীতিমত চকিত হয়ে সাইকেলটা হাতে নিয়ে তিনি হাঁটছিলেন। খানিকটা দূরে ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের রঙিন বাতি দেখতে পাওয়া যায়, আরও খানিকটা হাঁটলেই তাঁর কোয়ার্টার।

এই সময় তিনি দেখতে পেলেন, লাইনের ধারে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে দুজন মানুষ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ওদের চিনতে ভুল হয়নি সবিতৃর। একজন রিলিভিং ষ্টেশন মাষ্টার কালীপদ নন্দী, আর একজন টিকিট ক্যালেকটার বলরাম মল্লিক। ওরা যেন মার্জারের লুব্ধ প্রত্যাশা নিয়ে ওৎ পেতে বসে রয়েছে। মাঝে মাঝে শুধু একটা ফিসফিস শব্দ।

কাটিহার অঞ্চল থেকে পার্বতীপুর হয়ে একখানা ট্রেন আসছে। ছোট ছোট দোকানএর মালিকরা নিষিদ্ধ এলাকা থেকে ডাল, তেল, লবন, চিনি আরও নানা জিনিষ আমদানী করে নিয়ে আসে। সুড়ঙ্গেরও উপদ্রব কম নয়, বার বার গাড়ী বদল আব ট্র্যাফিক স্টাফের ফাঁড়া, হাবিলদার আর বেঙ্গল পুলিশের ধাক্কা, ক্রুম্যান আর টিকিট চেকারের দৃষ্টি অতিক্রম করতে করতেই তাদের লাভের গুড় যেন পিঁপড়েয় খায়।

তা হোক। জিনিষপত্র দুর্মূল্য হয়, দুর্লভ হয় না। ভাতের গ্রাসে মানুষ একটু লবণের আস্বাদ পায়।

তাই ওরা আর স্থানীয় স্নুড়ঙ্গের চুনো-পুঁটি থেকে রুই-কাতলার উপদ্রব সইতে রাজী নয়। ষ্টেশনের কিছু আগেই চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে দরজা জানলা দিয়ে মালপত্র নামিয়ে দেয়।

কাপড়ে আর গামছায় বাঁধা ছোট ছোট বোঁচকা ও পুটলি লাইনের ফাঁকে ফাঁকে জমা হয়ে ওঠে, ট্রেন বেরিয়ে গেলেই ঝোপ জঙ্গলের আড়াল থেকে মনুষ্য মূর্তি বেরিয়ে এসে সেগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কিন্তু কালিপদ নন্দী আর বলরাম মল্লিককে ফাঁকী দেবার কারও সাধ্য নেই। ওদের অবাধ গতিবিধি সর্বত্র, পৃথিবীর একটা ঝরাপাতা, একটা বালুকণারও ওরা যেন অংশীদার। রেলের মালিকানাও ওদের। মন্দিরের যেন দ্বাররক্ষক, দক্ষিণা না দিয়ে পথ চলবার উপায় নেই। সাইকেলের সঙ্গে রেললাইনের বেড়া-তারের আর খোয়ায় ধাক্কা খাওয়ার পরিচিত শব্দটি এ অঞ্চলে প্রায় সকলেই চেনে।

নন্দী মশাই বললো, "কে ডাক্তারবাবু নাকি ?"

সবিতৃ উত্তর দিলেন, "অন্ধকারের মধ্যে আপনারা এখানে কী করছেন নন্দীমশাই ?"

ফিসফিসিয়ে উঠলো নন্দীর কণ্ঠ। "কত ধান্দায় আমাদের ঘুরতে হয় ডাক্তারবাবু, নাড়ী টিপলেই তো আমাদের পেট ভরেনা।"

এর উত্তর বুঝি কিছু নেই। সবিতৃ বললেন, "নন্দীমশাই, দুধের কী ব্যবস্থা করা যায় বলুন তো ?"

"কেন হাটে তো দশ বারো আনায় পানসরা বিক্রী হয়।"

"সেই তো তিন পোয়া মাটীর ভাঁড়গুলোকে পানসরা বলে, সে-তো বড় লোকের জন্যে, ঠিকেদার আর মিষ্টি ব্যবসায়ীদের জন্যে।" সবিতৃ এবার আগ্রহের সঙ্গে বললেন, "বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কেমন ? তাঁকে সঙ্গে নিয়ে একবার হাটে যেয়ে দুধের দর নামানো যায়না ?"

"প্রেসিডেন্ট," ঠোঁটের কোণে অবজ্ঞা ছড়িয়ে বিকৃত কণ্ঠে নন্দী

বললো, "সে তো রোজ মাগ্‌নায় এক পানসরা দুধ খেতে পায়, সুতরাং—"

সবিতৃ বললেন, "তবুও চলুন কাল একবার থানার দারোগা আর প্রেসিডেণ্টকে সঙ্গে নিয়ে হাটে যাই।"

সবিতৃ আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেন। ঠোঁটদুটি উল্টিয়ে নন্দী বললো, "দেখলে তো মল্লিক, পকেটটা কী উঁচু করে নিয়ে ফিরলো।"

মল্লিক আর নন্দীর স্বভাব-বৈশিষ্টের পার্থক্য এই,—মল্লিক দাবী আর প্রভুত্বেই হোক নীতি আর দুর্নীতিতেই হোক উপার্জন করলেই খুশি থাকে, কিন্তু নন্দী অপরের পাওয়াকে আদৌ বরদাস্ত করতে পারেনা।

মল্লিক বললো, "এ-সব ভাই মানুষের অদৃষ্ট, কত ডাক্তার এল গেল, এমন পপুলারিটি কয়জন পেলো বল?"

ক্রূর সাপ যেন বিষাক্ত নিঃশ্বাসে গর্জে উঠলো, "পপুলারিটি, ভাগ্য, তুমি সরকারী ওষুধ নিয়ে দাতব্যখানা খুলে বসেছ? থামোনা, সোজা সাহেবের কাছে য়্যানিনেমাস চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছি।" দাঁতে দাঁত ঘসলো নন্দী।

ইত্যবসরে শব্দ পাওয়া গেল, দূরে ট্রেন আসছে। ওদের দুজনের চকিত দৃষ্টি সতর্ক হয়ে উঠলো।

হু হু শব্দে ট্রেনখানা ষ্টেশনের দিকে পার হয়ে গেল। ঝুপঝাপ টুপটাপ করে কতকগুলি পোটলা পুটলি এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লো।

নিকটবর্তী ঝোপ জঙ্গল গাছ পালার আড়াল থেকে অশরীরি আত্মার মত কয়েকটি লোক বেরিয়ে এসে লণ্ঠনের আলোয় নিজের চিহ্নিত মালগুলি উদ্ধার করে নিয়ে প্রহরী দুটিকে কিছু দক্ষিণা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। নন্দী আর মল্লিক টর্চ-বাতি জেলে আরও কিছু সন্ধান করতে লাগলো। আরও কয়েকটি লোক জড়ো হয়েছিল। নন্দী বললো, "আহ্লাদ দেখো, আমি বাতি জ্বালবো আর উনি মাল খুঁজবেন।"

"বেশতো তোমার বাতি নিভিয়ে দাওনা, আমার চোখেই মানিক

জলছে।" লোকটা সঙ্গে সঙ্গে একটা আড়াই সেরের চিনির মোড়ক কুড়িয়ে পেলো।

"বারে, মজার অংশীদার, আমার বাতির আলোয় উনি মাল নেবেন।" হিংস্র কণ্ঠে বলতে বলতে নন্দী যেন বাঘ-ছোবলে ওর হাত থেকে চিনির মোড়কটা ছিনিয়ে নিল।

লোকটি একজন গ্রাম্য মানুষ। একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললো, "বাবু তোমরা বড়লোক, ভদ্দরলোক, লেখাপড়া জানা লোক, যা করবে আমাদের মেনে নিতে হবে।"

"যত্ত সব," অবজ্ঞার পদবিক্ষেপে এগিয়ে যেতে যেতে নন্দী বললো, "এই সব লম্বা-চওড়া বুলির শিক্ষাদাতা কে জান তো? ওই গেটম্যান ছোকরা বিদ্যুৎ, সরকারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ওই বোকা লোকগুলির চোখ ফুটিয়ে দিচ্ছে।" মল্লিক বললো, "যাকগে, ওরা মরুকগে, আমাদের সের আড়াই চিনি হয়েছে, পরেশ ময়রাকে তিন টাকার কম ছাড়া হবেনা।"

"তিন টাকা কী হে। চার টাকার এক পয়সা কম নয়," ফোলাগাল ফুলিয়ে নন্দী বীভৎস খুশির হাসি হাসতে লাগলো।

টিনের ছাদ আর কঞ্চির বেড়া দেওয়া পরেশ ময়রার দোকানে খান-কয়েক হাতলভাঙা চেয়ার আর পায়ানড়বড়ে চেয়ার। দুটো কাঁচের আলমারী রয়েছে একদিকে। ভিতর দিকে চুল্লিতে দাউ দাউ করে আগুন জলছে, রসোগোল্লা, পান্তুয়া, সন্দেশ হরেক রকম মিষ্টান্ন তৈরীর আয়োজন হচ্ছে।

পরেশ ময়রা নিকেলের চশমা চোখে দিয়ে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে হিসাবনিকাশ করছিল। ওদের দুজনের পায়ের শব্দে চোখ তুলে মৃদু আপ্যায়ন জানিয়ে বললো, "আসুন নন্দী মশাই, মল্লিক মশাই, বসুন।"

"না হে আর বসবোনা" নন্দী বললো, "খুব তো হিসাব দেখছ, একেবারে যে লাল হয়ে উঠলে।"

"কই আর লাল হতে পারলুম মাস্টার মশাই, জওহরলাল তো জেল থেকে বেরিয়েই বললেন, কালোবাজারীদের ফাঁসিতে লটকাবেন, এইসব দেখে শুনে একেবারে তো ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে গায়ের রক্ত। গলার স্বর নামিয়ে পরেশ বললো, "কিছু চিনি পেলেন?" চিনির বোঁচকাটা এগিয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে নন্দী বললো, "আসামের এক মহাজন সের দশেক চিনি নিয়ে যাচ্ছিল, পাকড়িয়েছি, ঘুষ দিতে চায় বললুম না, সস্তা দরে কিছু বেচে যাও।"

মল্লিক বললো "তোমার জন্যে চার টাকা দরে এই তিনসের চিনি কিনলুম।" পরেশ বাক্স খুলে বারোটি টাকা বের করে দিয়ে মনে মনে বললো, "আহা, বিড়াল তপস্বী তোমরা। যাক, আমার ব্যবসাটা তো বাঁচুক।"

টাকাগুলো গুনতে গুনতে নন্দী বললো, "বুঝলে পরেশ, কাল রেলের ডাক্তার প্রেসিডেন্ট আর দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে হাটে যাবে দুধের দর নামাতে।"

"য়্যাঁ, দুধের দর নামাতে," চমকে উঠে পরেশ বললো, 'গাঁয়ে কটাই বা গরু আছে, বাতাসে খবর ঘোরে, ছড়িয়ে পড়তে পড়তে সব দুধ বাইরে চলে যাবে।"

মল্লিক বললো, "তুমি ভোরেই লোক পাঠিয়ে সব দুধ বায়না করে ফেল পরেশ।"

"না বাবু, আর ভোরে নয়" পরেশ বললো একটি কারিগর আর অনুজ রমেশের উদ্দেশ্যে—"যা তো রে রমেশ আর হবি একটা বাতি নিয়ে, বসন্ত বৈরাগী, হারু বর্মন, আবুল ফজলকে বলে আসবি গ্রামের সব দুধ ওরা যেন আটকায়।"

নন্দী স্বভাব প্রসিদ্ধ ফিসফিসিয়ে বললো, "ওরা গাঁয়ের মোড়ল ওদের বললেই হবে।"

ছয়

মানসিক অবসাদে সবিতৃ বড়ই পরিশ্রান্ত। অশ্রান্ত বর্ষণে বর্ষা নেমেছে। ঘরে ঘরে মানুষ কাঁথা মুড়ি দিয়ে কোঁকাতে সুরু করেছে। ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়ায় দেশটা ছেয়ে গেছে। কিন্তু সে পরিমাণে ওষুধ কই? কুইনাইন কই?

"বাবুগো, কাঁপায় কাঁপায় জ্বর।" "বাবুগো, সোনার ধান ঘরে তুলতে না পারব।" "বাবুগো, হাল ফেলায়ে চলে এলাম, একটু বড়ি, একটু পিল।"

ডাক্তার নিরুপায়। এ অভিজ্ঞতা ডাক্তারের নূতন নয়! আরও ভয়াবহ মর্মন্তুদ গ্রামের রূপ তাঁকে দেখতে হয়েছে। তেরশ পঞ্চাশের অন্ন-সংগ্রামের ধাক্কা সামলে যারা বেঁচে রইল, নূতন ধান ঘরে তুলবে, সোনালী স্বপ্ন বুকে নিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল।

কিন্তু সে আশাও তাদের সার্থক হয়নি। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে চাষী চীৎকার করেছিল, "ধান—আমার পাকাধান।" শুকনো মাঠে কাঁচাহলুদ ধান ঝরে পড়লো, যে পারলো লুটে নিল। তৃণ ভোজীরা কিছু সদ্ব্যবহার করলো।

সেদিনের মত আজকের অবস্থা অতটা ভয়াবহ নয়, তবু যথেষ্ট পরিমাণে ওষুধ পথ্য কই?

সবিতৃ ভাবেন এই আশা-উন্মুখ লোকগুলোকে যথার্থ সুস্থ করে তোলবার তার যখন ক্ষমতা নেই, এ অনাকাঙ্খিত চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি বাড়ী চলে যাবেন।

লাবণ্য বলেছে রুণু নাকি আমাকে ভালোবাসে, আরও সে বলেছে আমি নাকি রক্তে মাংসে গড়া মানুষ নই, তার অনেক উর্ধে। এবার ডাক্তার আপন মনে একটু না হেসে পারলেন না। মানুষের উর্ধে কিনা তিনি জানেন না তবে দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না।

বাড়ীতে তিনি আজ কার স্নেহ ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দেবেন?

কোথায় জন্মভূমি? গৃহ তাঁর কোথায়? কোথায় তাঁর সেই গৃহের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ? জননীশূন্য গৃহে বুঝি পুত্রের কোনও আকর্ষণ থাকে না। সেদিন পনেরো বছরের বালকের মার মৃত্যুর পর বাবা যেদিন আবার বিয়ে করে বৌ ঘরে আনলেন, সেইদিন সবিতৃর বুকের মধ্যে একটা রুদ্ধ অভিমান গুমরে উঠেছিল। তাঁর মার আত্মার প্রতি একটা অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধা তাঁকে এত বেশী আহত করে ফেললো যে সেই কারণেই সবিতৃ নতুন মাকে যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাতে পারলেন না। মনের মধ্যে শুধু চাপা রইল একটা অব্যক্ত বেদনা।

বিকেলবেলা ট্রেন থেকে একটি কলেরা রোগীকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাধ্যমত শুশ্রূষা করেও তাকে সুস্থ করতে পারেননি তিনি। আত্মীয়স্বজনহীন মৃত ব্যক্তির সৎকারেরও কোনও ব্যবস্থা সম্ভব হয়নি। পরদিন হেড অফিস থেকে ডোম আসবে। মৃত দেহটিকে হাসপাতালের বারান্দায় রেখে তিনি কোয়ার্টারে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু ঘুমুতে পারেন কই? তন্দ্রা আসে, আবার ভেঙে যায়, নাম-গোত্রহীন অস্পৃশ্য কলেরা রোগীকে 'মেথরও' স্পর্শ করবে না, কিন্তু শেয়াল যদি ওকে ইতিমধ্যে সাবাড় করে ফেলে?

একটু তন্দ্রা নেমে এসেছিল, হঠাৎ মনে হোল কে যেন তাঁর কানে কানে বললো, "আমার ঘর, আমার স্ত্রী, আমার ছেলে।"

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন সবিতৃ ডাক্তার, স্পষ্ট দেখলেন নাম-গোত্রহীন

কলেরা রোগী যেন আকুল আবেদনে তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে। আবার ডিসপেন্সারীতে সবিতৃ এলেন, মৃতদেহের একখানা পা ইতিমধ্যে বুভুক্ষিত শৃগাল আত্মসাৎ করে ফেলেছে।

ডিসপেন্সারীতে জায়গা ছিলনা, স্টোর রুম খুলে মৃতদেহটি টেনে নিয়ে সবিতৃ ভিতরে রেখে আবার কোয়ার্টারে ফিরে এলেন।

অন্ধকার থমথমে রাত্রি। আড়াইটে কী তিনটে বেজেছে। কালো মেঘ জমাট বেঁধেছে আকাশে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চকমক করছিল. টিপটিপ করে পড়ছিল, এইবার অশ্রান্ত পায়ে বর্ষণ নেমে এল ঝমঝমিয়ে।

ডাক্তারের ভাঙা ঝরঝরে কোয়াটার, মাটির প্রলেপ দেওয়া কঞ্চির বেড়া। খোড়ো চাল বেয়ে ঝরঝরিয়ে জল পড়তে লাগলো।

সবিতৃ একা মানুষ। একখানা ঘরই যথেষ্ট। একখানা ঘরে ডিসপেন্সারী, একখানা ঘরে পুরোনো চাকর দেবেন ঘুমোয়। দেবেন নিছক ভৃত্য নয়, জননীর স্নেহ ও সেবায়, বন্ধুর বাৎসল্যে সে তাঁকে যেন আগলে রেখেছে। সারা ঘর বেয়ে জল পড়তে শুরু করেছিল। সবিতৃ বারান্দায় বেরিয়ে এসে ইজিচেয়ারে বসলেন। দেবেনের ঘুম ভেঙে গেছলো, উঠে বসে আকস্মিক নিদ্রাভঙ্গে বিরক্তি প্রকাশ করে বললো, "বাবারে, রাতের বেলা একটু ঘুমোবার জো নেই, চুল চিরে ঘরের ভাড়া আদায় করে নেবে, মানুষ ভিজে মরবে, তবু সারিয়ে দিতে পারবেনা।"

"ওভারসীয়ারকে চিঠি দিলুম তো রে দেবু" সবিতৃ মৃদুকণ্ঠে বললেন।

"রেখে দিন আপনার ওভারসীয়ার।" ঝাঁঝাল কণ্ঠে দেবেন বললো, "এখানে তো উপরি নেই, তিনি কেন করবেন? বড় সাহেবকে চিঠি দেননা একটা।"

"বড় সাহেব।" সবিতৃ এবার না হেসে পারলেন না। "তারা বড়

মানুষ, তাদের কত বড় চিন্তা, বড় বড় স্কীম, সামান্য এক ডাক্তারের ভাঙা কোয়ার্টারের কথা তাদের মনে রাখবার অবসর কই ?"

কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে শুয়ে দেবু আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সবিতৃ বর্ষণ মুখরিত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অস্পৃশ্য মৃতদেহ, শৃগালে সাবাড় করা একখানা পা তাঁর মনকে আনমনা করে তুলেছিল।

ঘন অন্ধকারের মধ্যে সিগন্যালের লাল নীল আলোগুলি অশরীরী আত্মার মত চকচক করছিল। মাঝে মাঝে মেঘের বুক চিরে বিদ্যুৎ ঝকমক করছিল।

আজ সকালে বিদ্যুৎ এসেছিল। "দাদা অগাষ্ট আন্দোলনের মণ্টুদা তিন বছর পর ধরা পড়লো।"

"কে মণ্টু? ওই যে বাজারে যার কাটা কাপড়ের দোকান রয়েছে?"

"হ্যাঁ দাদা," গলার স্বর নামিয়ে বিদ্যুৎ বললো, "আমাকে—"

"থাক আর বলতে হবেনা, ওর আসল নাম বিকাশ তো, আমি তখন সরভোগে ছিলুম, থানা পুড়ছে, ডাকঘর জ্বলছে।"

ক্লিষ্ট মুখে বিদ্যুৎ বললো, "নন্দী ধরিয়ে দিলে, বুঝলে দাদা। মাগ্‌না জামা সেলাই করে দিতে বলেছিল, মণ্টুদা তা পারেনি; যাকগে।" একটা নিঃশ্বাস ফেলে বিদ্যুৎ বললো, "মণ্টুদা আমাকে দোকানটার ভার দিয়ে বলেছে, ওর বৃদ্ধা মা, ছোট ভাইবোনগুলিকে রক্ষা করতে হবে; সরকারী চাকরীর সঙ্গে তো আর দোকান করা চলেনা, বাড়ীতে মেসিনটা নিয়ে এসেছি, লাবণ্য সেলাই করবে, আমি হাটে বেচে আসব, কাপড়ের জন্যে আমার কিছু টাকা দরকার। আসামে আমার এক বন্ধু কিছু কাপড় দেবে বলেছে, মুকুটও কাপড় দিতে পারবে। ওর মা—মুনা মাসীমা বাড়ীতে একটা তাঁত বসিয়েছেন।"

সবিতৃ টাকার কথাই ভাবছিলেন। মাইনের টাকাগুলি বাবাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাবা আশীর্বাদ করে লিখেছেন, "পলাশপুরের জমিটা বাকী খাজনার দায় নিলাম হয়ে গেলরে, সহোদর ভাই সেটা কিনে নিল। ভেবেছিলুম, ইস্কুলটা যদি আবার বসে মাষ্টারীটা করতে পারবো, কিন্তু ভাতের দুঃখে যেদিন যে ছাত্ররা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছলো তারা আর ফিরলো না। ইস্কুল বাড়ীটা সরকারী চালের গুদাম হয়ে গেল, আর কোনও আশা ভরসা নেই। খোকা, বাপকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত করতে তুই একবার বিয়ে করেছিলি, আবার তুই বিয়ে কর, আমি আশীর্বাদ করছি তুই সুখী হবি। রুণু মেয়েটি সত্যিই তোর উপযুক্ত। রমেশ বলে মেয়ে আর বসে সময় কাটাতে রাজী নয়, ঢাকায় একটা স্কুল-মাষ্টারী পেয়েছে, চলে যাবে।"

প্র্যাকটিসের কিছু টাকা তাঁর এখনও বাকী রয়েছে, ছয় আনির ছোট তরফের বধুরাণীর তাজা সন্তান প্রসব করিয়েছেন। পাটের দালালকে কুৎসিত ব্যাধি থেকে মুক্ত করেছেন। এঁরা পারিশ্রমিক ছাড়াও পুরস্কার দেবেন। বিদ্যুৎকে কাপড়ের টাকাটা দিয়ে দিতে পারবেন।

ল বণ্যর মেয়েটিরও ওষুধ ফুরিয়েছে, সে যেন একটু ভালোর দিকে মনে হচ্ছে।

স'বতৃর ব্যক্তিগত কিছু টাকারও প্রয়োজন।

দাসত্বের এ অসহ্য বাঁধন থেকে তাঁকে মুক্ত হতে হবে বৈকি। বেশী কিছু নয়, নিজস্ব একটি ডাক্তারখানা; যেখানে কোনও কৈফিয়তের তলব তার মনুষ্যত্বে আঘাত হানবে না, অপমানে আর অসম্মানে জর্জরিত করবে না। পকেটে তাঁর অফিসিয়াল চিঠিখানা তখনও রয়েছে। বিভাগীয় বড় সাহেব জানিয়েছেন, সরকারী ওষুধপত্র অকারণ ব্যয় হয়, এ বিষয় সতর্ক হওয়ার জন্য তোমাকে জানানো হচ্ছে।

ডাক্তারের বুকের মধ্যে একটা অসহ্য কাঁটা খচখচ করে।

বৃষ্টি থেমে আসে। আকাশ ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়।

এই সময় কমপাউণ্ডার মৃতপ্রায় কণ্ঠে এসে ডাকলো, "ডাক্তারবাবু," হাঁফানী রোগী, খকখক কেশে একটানা দম নিয়ে বললো, "কেতাবুদ্দিনের কিছুতে জ্বর ছাড়েনা, একটা ইনজেকসন দিয়ে দিয়েছিলুম, হাতের ঘা কিছুতে শুখোয় না। এই লোকগুলোর উপর ডাক্তার রেগে ওঠেন যত, তার চেয়ে করুণা হয় বেশী। চিকিৎসা-বিজ্ঞান জানা নেই, অজ্ঞ নিরক্ষর মানুষদের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে ওদের চিকিৎসা করতে নেমে ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া রোগীকে এক আসনে বসিয়ে মানুষগুলোকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তবু দোষ দেওয়া যায় না কমপাউণ্ডারকে এই জন্যে, যতগুলো মানুষের মুখে তাকে খাদ্য তুলে দিতে হয় সে পরিমাণ রোজগার তাঁর হয় না।

সবিতৃ জিজ্ঞেস করলেন, "ব্লাড নিয়েছিলেন ?"

আবার খকখক একটানা কাশি, বললো, "না স্যার, আপনি একবার শুনুন, ওরা আপনার কাছেই আসে, আপনি যখন থাকেন না, কেসগুলো আমি হাতে নিই। কাশির ধাক্কায় কমপাউণ্ডার থেমে গেল।

সবিতৃ বললেন, "আপনি ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকুন, আমি সাইকেলে যাব।"

দেবেনকে চা আনতে বলে। টুথ ব্রাসে দাঁত ঘষতে ঘষতে সবিতৃ বললেন, "একটু রেসপনসিবিলিটি নেই, রোগীকে একেবারে থেঁতলে খবর দেবে, মানুষের জীবন নিয়ে কী নিষ্ঠুর ছিনিমিনি খেলা, জীবন-বুভুক্ষার পায়ে এই যে জীবন-সত্যের প্রতি মুহূর্তে বলিদান, এর পরিণতি কোথায় ?

সাত

কেতাবুদ্দিনকে কতকটা আয়ত্তে এনে ওর রক্ত নিয়ে সবিতৃ P. W. Iর বাঙলোর দিকে রওনা হয়েছিলেন।

P. W. I. অর্থাৎ Permanent Way Inspector, এক কথায় প্লেটেলেয়ার সাহেব। রেললাইনের ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যেই ওদের কর্ম জীবনের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ।

এ পোষ্ট শ্বেতকায় মানুষদের জন্যেই নির্দিষ্ট, তাই বাসভবন ও বেতন ভদ্র সমাজের উপোযোগী। মৈনাকের বাবা এবং ঠাকুরদা' রেলকর্মী ছিলেন, কতকটা সেই দাবীতে মৈনাক সাদা চামড়ার একাধিপত্য আসনে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

ওরই অধীনে গেটম্যান বিদ্যুৎ, দুই গ্যাং শ্রমিক কেরাণী, মেট প্রভৃতিকে কাজ করতে হয়। মৈনাক ডাক্তারকে কল দিয়েছিল, ওর অনুজা অন্তঃসত্তা, তাকে দেখতে হবে। বর্ষার জলে ভেজা পথ-ঘাট, কোথাও পিচ্ছিল, কোথাও কাদা জমেছে, সবিতৃর সাইকেলের চাকা মাটিতে আটকে যায়, ট্রলি লাইনের পাশ দিয়ে মৈনাকের বাঙলোয় তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন।

তিস্তার গৈরিক স্রোত, উদ্দাম জলোচ্ছ্বাস। নদীর ঠিক ধারেই মৈনাকের সাজানো গোছানো বাঙলো, আইভিলতায় ঢাকা গেটের দুই পাশে রং বেরঙের সিজন্ ফুলগুলি বাগান আলো করে ফুটে রয়েছে। সবিতৃ গেটের গায়ে সাইকেলটা হেলান দিয়ে রেখে তিস্তার দুকুল ছাপানো যৌবন দেখছিলেন।

তাঁর সামনে দিয়ে খান কয়েক মিলিটারী ট্রাক বেরিয়ে গেল, ধানের জমির মধ্যে দিয়ে ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল। মার্কিন সৈন্য। ভারতবর্ষের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ওরা একদিন এদেশে এসেছিল। গ্রাম-গ্রামান্তরে টেলিগ্রামের তার, ওয়ারলেশ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে যুদ্ধকে চালু রেখেছিল এতদিন। মুহূর্তের মধ্যে মাইলের পর মাইল ওরা বড় বড় কাঠের গুঁড়িতে তার সংযোগ করে দ্রুত এবং গোপনীয় সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল।

আজ ওদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, পূর্বোদ্যমে আবার শালবল্লীর খুঁটি আর তারগুলো খুলে ফেলছে।

সবিতৃ লক্ষ্য করলেন ওদের ট্রাকের সামনে মৃত শিশুর মুণ্ডু, কোনওটিতে মাথার খুলি, কোনওটিতে কঙ্কাল দেহের অংশ লটকানো। বীভৎস মূর্তি, শৃগাল কুকুর কতকাংশ সাবাড় করেছে।

বাঙলোর ভেতরে ফক্সটেরিয়র কুকু র ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠলো। উজ্জ্বল মসৃণ গলায় থোপা থোপা লোম, নীল চকচকে চোখ।

চাকর হিসেবে কাজ করে, একজন রেলওয়ে শ্রমিক ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। "ডাক্তারবাবু, প্রাতঃপ্রণাম।"

সবিতৃ বললেন, "দেখেছিস মহেশ, মিলিটারী গাড়ীগুলোর সঙ্গে মানুষের মড়ার মাথা, দেহের কঙ্কালগুলো কী রকম ঝুলিয়ে রেখেছে।

"যুদ্ধ করে করে আর মানুষ মেরে মেরে ওরা অমানুষ হয়ে গেছে বাবু।" সহজ ভাবে মহেশ বললো, "ভাতের দুঃখে যে চ্যাঙড়াগুলো উকুনের মত পটপট করে মরেছিল, তাদের নিয়ে ওরা রঙ্গরস করে।"

আন্মনা সবিতৃ বাঙলোর ভেতর দিকে যেতে যেতে ভাবলেন, এই নরকঙ্কালগুলো ওরা হয়তো মার্কিন দেশে বহন করে নিয়ে যাবে, বাঙলাদেশের মন্বন্তরের চিহ্ন মিউজিয়মে যত্ন করে রাখবে। হাড়-গোড়গুলো দেখে মিস মেওর কলম আবার ধারালো হয়ে উঠবে, মুখর

বক্তব্যে তিনি বলে যাবেন, "মূর্খ, অজ্ঞ ভারতবাসী রাস্তায় মৃতদেহ ফেলে যায়, জীবন বোঝেনা, স্বাস্থ্য বোঝেনা।"

এবার সবিতৃ হল ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, সোফা-সেটিগুলো ঝকঝক তকতক করছে, ঐশ্বর্যের ঝলমলে পরিচয়।

মৈনাক ঘরে এসে ঢুকলো। সাহেবের পোষ্টে চাকরী। পুরোমাত্রায় সাহেবীয়ানা বজায় রেখে চলতে হয়।

মৈনাক মজুমদারের বয়স ছাব্বিশ সাতাশের কাছাকাছি। রং অত্যন্ত পরিষ্কার না হলেও দেখতে সুশ্রী, সুকুমার আননে একটু মাধুর্য মাখানো ছিল, কালো টানা ভ্রূর নীচে চোখদুটি উজ্জ্বল। চাল-চলন অত্যন্ত কেতাদুরস্ত।

নূতন চাকরী। দাসত্বের মধ্যেই সে জীবনের সন্ধান পেয়েছিল। দাসত্বের মোহ তার সমগ্র স্নায়ুতে প্রবহমান। চাকরীর নিয়ম-কানুন, আদব কায়দা নিখুঁতভাবে পালন করতো। পান থেকে চুণটুকু খসাও সে বরদাস্ত করতে পারতো না।

তবে চাকুরী জীবনে সাফল্য অর্জনের পথ ওর জানা ছিল না। কর্মচারীর চিত্তজয়ের আদর্শ সে অনুসরণ করতোনা, যুক্তির সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিচারে সে তাদের পরিচালনা করে, কিন্তু মিছরির ছুরির মত ধারালো কূটনৈতিক বুদ্ধিপ্রয়োগ ওর জানা ছিল না। তাই পদে পদে বাধা আর বিরোধ, দ্বন্দ্ব আর সংঘর্ষে প্রতি মুহূর্তে ও যেন বিপর্যস্ত!

মিষ্টি হেসে মৈনাক বললো, "Good morning Dr. Maitra, I see, আপনাকে ট্রলি পাঠিয়েছিলুম, ফিরে এল।"

"একটা আর্জেন্ট কলে সকালে বেরিয়েছিলুম কিনা।"

"বেয়ারা, গোপা দিদিকে খবর দাও, ডাক্তার সাহেব এসেছেন।" মৈনাক চিন্তিত মুখে বললো,—"বুঝলেন Doc, আমার Sister

going on four months pregnant, ভগ্নিপতি ফিল্ড সার্ভিসে চলে গেছে, শ্বশুরবাড়ী থাকতে চায় না; মা নেই, বাবা কাশীবাসী। আমি ব্যাচেলার মানুষ, এই বন জঙ্গলের মধ্যে একা।"

সবিতৃ বললেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিঃ মজুমদার, কাছেই যখন লালমনিরহাটে রেলওয়ে বড় হসপিট্যাল রয়েছে, ইমিডিয়েটলি সব সুবিধে আপনি পাবেন।"

মৈনাক একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো, "আপনি আমাকে নিশ্চিন্ত করলেন Doc,— So kind to you."

এইবার গোপা ঘরে প্রবেশ করলো। বয়স আঠার উনিশের মধ্যে, ঈষৎ স্থূল ধরনের দেহের গঠন, অগ্রজের মতই শ্যামবর্ণ, কালো টানা ভ্রূর নীচে চোখ দুটি বেশ উজ্জ্বল। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার পর শিক্ষা-জীবনে আরও অগ্রসর হবার সুবিধে-সুযোগের অভাব না থাকলেও, এদিকটায় অনুরাগ ছিল না। জর্জেট, সীফন, ব্রোকেড আর চা-পার্টি জীবন-স্বপ্নের চরম লক্ষ্য, ধনীত্বকে আয়ত্তে আনাই জীবন-আদর্শের কাম্য। ওর স্বামী বার তিনেক ইওরোপ ফেরৎ, কেন সে ইওরোপ গেছে এ তথ্য কারও জানা নেই, স্বামী লণ্ডন ফেরৎ এইটেই গোপার গৌরবের। স্বামী যুদ্ধ ফেরৎ ক্যাপ্টেন সম্মানে ভূষিত হবে এইটেই গোপার গর্বের।

সবিতৃ গোপার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কয়েকটি গতানুগতিক প্রশ্ন করে প্রেসক্রিপসন লিখতে সুরু করলেন।

মৈনাক বললো, "বড্ড পেল হয়ে গিয়েছে ডাক্তার মৈত্র, গোপা তোর হেলথের কথা বল, লজ্জা করিস নে।"

গোপা কী বলবে? মাতৃত্বের সম্ভাবনার এ অনুভূতি অনুভব করা যায়, প্রকাশ করা যায় না, এ শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য উপলব্ধি করার মত,

প্রকাশ করা সহজ হয় না। গোপা শুধু সংক্ষেপে বললো, "বড় টায়ার্ড, ডাক্তার মৈত্র।"

"টায়ার্ড তো হবেনই," ডাক্তার বললেন, "মা হওয়া কী সহজ কাজ।"

এই সময় কয়েকজন লাইন শ্রমিক বারান্দায় ঘরের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। ওরা লাইন খালাসী, রেল লাইনকে সচল রাখে, ভাঙাচোরা সংস্কার করে, চাবি ঠিক রাখে, লাইনের ধারে খোয়াও ছড়ায়, জঙ্গল পরিষ্কার করে, রাত্রিবেলা লাইনে পাহারা দেয়। অধিকাংশই মালদহ, মানভূম, বীরভূম প্রভৃতি জেলার লোক। সাঁওতাল জাতের সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে, সাঁওতালী রক্তের উদ্দীপনা ওদের স্নায়ুতে প্রবাহিত। স্বভাব কঠিন দৃঢ়তায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ এবং অটল।

পরিধানে ওদের মিলিটারী পরিচ্ছদ। ওদের সাহেবকে সেলাম দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বললো, "হুজুর কাল সমস্ত রাত্রি আমরা লাইন পাহারা দিয়েছি, এখন আমাদের রেস্ট, কিন্তু বড় মিস্ত্রি বলছে, 'ডব্লু-ডি এঞ্জিনে তিন নম্বর লাইন খারাপ হয়েছে, এখুনি যেতে হবে, তা নাহলে নাগা করে দেবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মৈনাক জিজ্ঞেস করলো, "এখন ডিউটি কাদের ? তারা কোথায় ?"

"হারু, মধু সিক, জ্বরে কোঁকাচ্ছে, লাইনের পইণ্টে রামুর আঙুল কাটা গেছে।"

জটিল সমস্যা। অতিরিক্ত লোক নাই। এদের কাছেই কাজ পেতে হবে অথচ। মৈনাক লোকগুলোকে বললো। "তোমরা যাও, মেটকে পাঠিয়ে দাও, আমি ব্যবস্থা করব।" ওরা চোখের আড়ালে চলে গেল। অসহিষ্ণু কণ্ঠে মৈনাক বললো, "I can not manage them, impossible."

"আপনার হাতে যখন Extra লোক নেই, শ্যামকূল-রাইকূল

আপনার দুই দিকই বজায় রাখতে হবে, ওদের মিষ্টি কথায় আপন করে ওদের মধ্যে আপনাকে জনপ্রিয়তা পেতে হবে।"

"সে হয়না ডাক্তার, ওদের সঙ্গে মিষ্টি কথা বললেই ওরা প্রশ্রয় পায়। তারপর ওদের দাবী মেটানোর ক্ষমতা তো আমার হাতে নয়।"

"তাহলে আর এক পন্থা অবলম্বন করুন।" ডাক্তারের চোখে শ্লেষের বিদ্যুৎ চমকালো। "আপনি সেই নীতি অনুসরণ করুন, সাম্রাজ্যবাদী প্রেম ওদের মধ্যে বিতরণ করুন, ভারতবাসীর জন্য বিলাতের মন্ত্রীসভায় যে প্রেমের প্রবর্তন, ধাপে ধাপে অবতরণ, আপনিও বলুন রেল কোম্পানী তোমাদের কত উন্নতি করে দেবে, কত সুবিধে সুযোগ।' —বলতে বলতে সবিতৃর কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে আসে। "জানেন আপনি, সমস্ত দোষ Administration-এর। মানুষকে মানুষের মত বেঁচে থাকবার অধিকার ওরা দেয়না।

মৈনাকের দৃষ্টিতে একান্ত অসহায়ের ভাবটি পরিস্ফুট হয়ে উঠলো, অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠে সে বললো, "Kindly ডক্টর, আপনি এদিকটা সমর্থন করবেন না। আমার পক্ষে চাকরী রক্ষা করা অসম্ভব হবে; আপনি জানেন, কিছুদিন আগেও এই লোকগুলোর বড় সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা ছিলনা। পশুর মত খেটেছে, কোনও দিন আপত্তি জানায়নি, আজকে আমি জানি গেটম্যান বিদ্যুৎ ওদের বুদ্ধি জুগিয়ে দিচ্ছে। আট ঘণ্টার বেশী পরিশ্রম করলে ওরা য়্যালাউন্স চায়, সিক করলে ব্যাশান য়্যালাউন্স কাটতে দেবেনা, বলে, 'আমার পরিবারবর্গতো আর সিক নয়.' ওরা একেবারে আমাকে না জানিয়ে হেড অফিসে দরখাস্ত পাঠিয়ে দেবে। আফসে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমি নাকি Incompetent man, ওদের পরিচালনা করতে পারি না।"

সবিতৃ কী উত্তর দেবেন? সমস্যা অত্যন্ত জটিল।

গোপা বললো, "জানেন ডাঃ মৈত্র, আমি দু একখানা Application দেখেছি, মেয়েদের হাতের লেখা।"

মৈনাক আবার বললো, "ডাঃ মৈত্র, বিদ্যুৎ নাকি আপনার আত্মীয়, আপনি ওকে একটু কন্ট্রোল করুন। গোপা, একটা দরখাস্ত নিয়ে আয়তো।"

সবিতৃ একান্ত অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। বিদ্যুৎকে তিনি কী বলবেন? মানুষকে জীবন-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যে বিদ্যুতের জীবন-স্বপ্ন, তাই কত না আগ্রহে সেদিন সে তাঁকে বলেছিল, "দাদা ওই দারিদ্র্যের অজ্ঞতায়, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন পশুর মত মানুষ-গুলোকে আপনি স্বাস্থ্য দিন, আমি শিক্ষা আর বুদ্ধি দেব। ওদের আমাদের মানুষ করে তুলতেই হবে। ওরা আমাদের বৃহত্তর সম্ভাবনার একটা বিরাট অংশ।"

ডাক্তার নিজের সম্বন্ধেও সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন, চাকরীর বৃন্ত থেকে একদিন তাঁকে খসে পড়তেই হবে। জীবন-আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে, বিবেকবোধের টুঁটি চেপে ধরে দাসত্বকে আর যে তিনি বরদাস্ত করতে পারছেন না।

বিবেকবোধের নিষ্পেষণ ছাড়া আর কী বলা চলে? টালিক্লার্ক এসে ম্রিয়মান কণ্ঠে বলবে, "কালাজ্বরে ভুগে ভুগে শরীরে আর কিছু নেই, বড় সাহেবের অর্ডার, জয়েন করতেই হবে। আরও কয়দিন যদি দয়া করে সিক দেন।" ফ্যায়ারম্যান এসে জানাবে, "একটানা ষোল ঘণ্টা এঞ্জিনে রয়েছি ডাক্তার সাহেব, আর শরীর চলে না।"

দেখতে দেখতে ডাক্তারের সার্টিফিকেট বইতে সিক-ভেজ বেড়ে যায়, উপর থেকে কৈফিয়তের তলব আসে, Reminder আসে—

হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন সবিতৃ,—কর্মচারীর যথার্থ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য

রক্ষা করা Administration-এর ধর্ম নয়। হৃদয়বত্তা, প্রেম, মানবতা, দাসত্বের নির্মম যন্ত্রে নিরন্তর নিষ্পেষিত হয়ে যায়। মৈনাককে তিনি মোটেই সমর্থন করতে পারেন না, বলেন,—"দেখুন মিঃ মজুমদার, বিদ্যুৎ আমার আত্মীয়,—কিন্তু তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা তো আমার উচিৎ নয়।" অসহিষ্ণু মৈনাক উত্তেজিত কণ্ঠে বললো—"কিন্তু ওদের সমর্থন করা মানে Administration-এ ঘুণ ধরানো, আপনি বিশ্বাস করেন?"

হেসে উঠলেন সশব্দে ডক্তার মৈত্র, বললেন, "বিশ্বাস করি যে ঘুণ ধরানো Administration-এ ওরাই আগুন ধরিয়ে দেয়, অন্যায় আর অবিচারকে পুড়িয়ে ছারখার করে।"

গোপা দরখাস্তখানা নিয়ে এসেছে। সবিতৃ দেখতে লাগলেন শ্রমিকদের অভাব অভিযোগগুলি মেয়েদেরই হস্তাক্ষরে লিখিত।

মৈনাক বললো, "আমার কেরাণী অতুল বিশ্বাস বলেছে,—ষ্টেশনে এক ছোকরার রেস্টুরেন্ট আছে, তার ভগ্নী নাকি এই দরখাস্ত লিখে দেয়,—I have seen that girl Dr. Maitra."

ডাক্তার আবার হেসে উঠলেন — "ও আপনি কোহিনুরের কথা বলছেন? ওর ছোট ভাই মুকুট ষ্টেশনে রেস্টুরেন্ট দিয়েছে,—ওদের আমি অনেকদিন জানি।"

বিস্ময় প্রকাশ করে গোপা জিজ্ঞেস করলো,— "মেয়েরা রেস্টুরেন্টে কাজ করে? ওরা কী ভদ্রলোক ডাক্তার মৈত্র?"

"অফকোর্স" সবিতৃ বললেন, "মুকুটের বাবা এই তো পীরগাছা ষ্টেশনে ষ্টেশনমাষ্টার ছিলেন, অত্যন্ত Pathetic death তাঁর, মাল বুক করা নিয়ে কী গোঁজামিল ছিল, সহকর্মী ধরিয়ে দিল, শেষ পর্যন্ত প্রতুলবাবুকে আত্মহত্যা করতে হোল। মুকুট আর কোহিনুর আমাকে খুব শ্রদ্ধা করে, ডাক্তার কাকা বলে।

জর্জেট, সীফন আর ব্রোকেডের দেশের মেয়ে গোপা তবু বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনা। বললো,—"ডাক্তার বাবু, রেস্টুরেণ্টে কাজ করলে মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষা হয়?"

"সম্ভ্রম মর্য্যাদার চেয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠাই যে আগে দরকার গোপাদেবী।" সবিতৃ বললেন, "প্রতুলবাবুর স্ত্রী দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে যেন অথৈ সমুদ্রে যেয়ে পড়লেন, ভাগ্যে এদিকে কিছু ওরা জমি-জমা করেছিল, মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু করে নিয়ে ভদ্রমহিলা নিজের অলঙ্কার বিক্রী করে ছেলেমেয়ে দুটিকে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। রংপুর কলেজে ডেলি প্যাসেঞ্জারীতে কোহিনুর চতুর্থ আর মুকুট তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ছিল, ইতিমধ্যে যুদ্ধের ঘন দুর্য্যোগ নেমে এল। অস্ত্র, সৈন্য আর খাদ্য বোঝাই গাড়ী লাইনে চলতে লাগলো। মিলিটারী ট্রেনের প্রয়োজনে, প্যাসেঞ্জার গাড়ীগুলো বন্ধ হয়ে গেল, তারই সঙ্গে ওদের দুটি ভাইবোনের শিক্ষা-জীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটলো।

ডাক্তার বলতে লাগলেন, কিছু আবেশ, কিছু আবেগের সঙ্গে, "দুটি কিশোর-কিশোরীর সামনে তখন দাসত্বের কত রঙিন আর বিচিত্র প্রলোভন, কিন্তু দাসত্বের মর্মবিদারক অপমানকে ওরা বিস্মৃত হতে পারেনি, ঘৃণায় দাসত্বের আহ্বানকে বর্জন করলো। সামান্য মূলধন নিয়ে ছোট্ট একটি রেস্টুরেণ্ট করেছিল, ক্রমে ভাতডাল, লুচি-পুরীও সরবরাহ করতে লাগলো। ইতিমধ্যে চাকুর ঠাকুর বিভ্রাটে হোটেল প্রায় অচল হবার উপক্রম। মিলিটারীর সাদর ডাকে দেশশুদ্ধ মানুষ মেতে উঠেছিল। সেই সময় কোহিনুর অনুজের পাশে এসে দাঁড়িয়ে রেস্টুরেণ্টকে রক্ষা করেছে। সে রান্না করেছে, সব্জি কেটেছে, বাটনা বেটেছে, মুকুট, চা করেছে, সরবরাহ করেছে, বাজার করে এনেছে, কত বাধা বিপত্তি, সংঘর্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা—তবু ওরা টলেনি। রাত দশটার পর দুটি ভাই-বোন দোকান বন্ধ করে বাড়ী ফিরে যায়।"

ওরা দুটি ভাই-বোন মৈনাক আর গোপা যেন রূপকথার কাহিনী শুনছিল। কতকগুলি প্রশ্নে থেকে থেকে মৈনাক ঔৎসুক্য বোধ করছিল। কিন্তু নারীসংক্রান্ত ঘটনা, তাই ও নির্লিপ্তই ছিল। তা-ছাড়া যে নারী ওকে পদে পদে বিপর্যস্ত করছে, তার প্রতি একটু অন্তরে উষ্মাও রয়েছে বৈকি — শেষ পর্যন্ত ও নিজেকে সংযত করতে পারলো না, অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলো, "ডাক্তার মৈত্র,—আপনি kindly একটু মিস লাহিড়ীকে বলবেন, শ্রমিকদের তিনি যেন প্রশ্রয় না দেন—"

মৃদু হেসে সবিতৃ বললেন, — "এ কথার উত্তর আমাকে কোহিনুর কী দেবে জানেন? বলবে— আমি কারও গোলামী করিনা ডাক্তার-কাকা, কারও আদেশও মানতে পারবো না।"

আরও উত্তপ্ত হয়ে মৈনাক বললো — "কিন্তু সরকারী চাকরীতে বিঘ্ন ঘটালে India Defence Act-এর কবলে পড়তে হয়, সে কথা তিনি যেন না ভোলেন।"

স্মিত মুখে ঘরের বাইরে যেতে যেতে সবিতৃ বললেন,—"আপনি তার সঙ্গেই এ বিষয় আলোচনা করবেন, মিঃ মজুমদার।"

আট

মুকুট ও কোহিনুরেব পবিচয় প্রদানে সবিতৃব হয়তো কিছু অতিরঞ্জন ছিল না। তবে এই স্বাধীনচেতা ছেলেমেয়ে দুটি কাব অন্তরালবর্তী একনিষ্ঠ সাধনার প্রত্যক্ষ অবদান, সে কথা তাঁব জানানো হয়নি।

কোহিনুরের জননী মৃণালিনী দেবী নারীজীবনের কিছু ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিতা ছিলেন না, নিজস্ব প্রতিভায় ও প্রজ্ঞায় কিছুটা অসাধারণ ছিলেন। তাই বিবাহের পর স্বামীকে বলেছিলেন, "তোমাদের চাকরীর মধ্যে যে একটা দুর্নীতির সুড়ঙ্গ-পথ রয়েছে, সেটাকে তোমার পরিহার করে চলতে হবে।"

"কিন্তু আদর্শের রাস্তা যে জীবনধারণের উপযোগী নয় নূতন বউ" —প্রতুলবাবু সেদিন নববধূকে বলেছিলেন, "সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র কেবল মুষ্টিমেয় মানুষেরই সুখস্বাচ্ছন্দ মর্য্যাদা ও সম্মান দিয়ে থাকে, বাকী মানুষের প্রাণশক্তি ক্ষয় করে তিলে তিলে, না হয়, জীবন-আদর্শকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে গুঁড়ো করে দেয়। মানুষের অভিশাপ আর দীর্ঘ নিশ্বাসের উপব ওরা সভ্যতার সৌধ গড়ে তোলে।"

গৃহে হয়তো স্ত্রীকে সমর্থন করেন প্রতুলবাবু, কিন্তু দাসত্বের পারি-পার্শ্বিকের প্রলোভন তাঁকে দুর্নীতির সুড়ঙ্গের মধ্যেই আকর্ষণ করে। প্রতুলবাবু ক্রমেই তলিয়ে যান সুড়ঙ্গের অতল গহ্বরে। আরও অনেক মেয়ের মতই মৃণালিনীর দুর্ভাগ্য যে স্বামীর সঙ্গে মত না মিলুক, মন মিলিয়েই চলতে হয়। তবে স্ত্রীর স্বাধীনতায় স্বামী কোনও দিন হস্তক্ষেপ করেন নি, মধ্যবিত্ত রেল-সমাজে শিক্ষা-জীবনটা প্রায় অস্পৃশ্যই

বলা চলে, মৃণালিনী বরাবর ছেলেমেয়েকে সহরে রেখে উচ্চশিক্ষা-দানেরও ব্যবস্থা করেছিলেন।

পাবনা জেলার অন্তর্গত ক্ষুদ্র একটি গ্রামে প্রতুলবাবুর আদি নিবাস। রংপুর অঞ্চলে কিছু ধানের ও বসবাসের জমি তিনি করেছিলেন। মর্মন্তুদ জীবন-অভিশাপের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে মৃণালিনী দেশে ফিরে যাবার আর উৎসাহ পাননি। সন্তান দুটিকে নিয়ে জীবন-অধ্যায়ের আর একদিকের রচনায় তিনি মনোনিবেশ করলেন। কন্যার নাম কোহিনুর এবং পুত্রের নাম মুকুট রেখেছিলেন। পুত্র মুকুট কোনও নৃপতির মস্তককে অলঙ্কৃত করবে না, সে জাতীয় জীবনকে গৌরবান্বিত করবে, কোহিনুরের উজ্জ্বল আলোতে নীচতা আর সঙ্কীর্ণতা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

এখানে এসে সবিতৃ কয়েকদিন মৃণালিনীর গৃহে গেছলেন। স্বাস্থ্যে বর্ণে, মুখশ্রীতে তাঁর চেহারা সাম্রাজ্ঞীর মতই দৃপ্ত ও উজ্জ্বল, চোখের দৃষ্টি সুগভীর বেদনায় পরিম্লান, বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হয়েছে। ষ্টেশনের অনতিদূরেই কিছুটা আশ্রমের অনুকরণে গৃহ রচনা করেছিলেন। কয়েকটি ছোট ছোট খড়ের ঘর, দোচালা, একটা বড় আটচালাকে শ্রেণীবদ্ধ সুপারি কুঞ্জে ঘিরে রেখেছে। আশে পাশে কলাবন।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের অভিশপ্ত অধ্যায়ে নিরাশ্রয় ও নিরন্ন জনকয়েক নারী এই আশ্রমে আশ্রয় পেয়েছিল। ঘরে ঘরে রয়েছে তাঁত আর চরকা, জমিতে সাময়িক ফসল উৎপাদন করে ওরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। একদিকে তিস্তা নদীর কল-কল্লোল ধ্বনি, আর একদিকে মার্শাল ট্রলি লাইন, তারই মধ্যে দিয়ে সাইকেলে মন্থর পায়ে প্যাডল্ করতে করতে সবিতৃর একদিনের কথা মনে পড়লো।

মৃণালিনী বলেছিলেন—"ঠাকুরপো, জীবন-স্বপ্ন তো ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল,—ছেলেমেয়েকে প্রচুর বিদ্যায় বিদ্বান করতে চেয়েছিলুম,—

তাও বুঝি প্রহসন হয়ে গেল,—তবু মনে হয়—ভাঙা ঘরের মধ্যেও বুঝি একটু আনন্দের আলোর রোশনাই জ্বলেছে,—এমন দিন গিয়েছে মানুষের হাতে প্রচুর কাগজ, মুদ্রাস্ফীতির অভিনব রূপ, অথচ খাদ্য-ভাণ্ডার শূন্য। তখন আমি একটি জমির চাল অপব্যয় করিনি, আমার ছেলেমেয়েরা যোগ্য মূল্যে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে খাইয়েছে—” সাইকেল এগিয়ে চলে ষ্টেশনের দিকে—, সবিতৃ মৃণালিনীর স্বপ্ন আর আদর্শবাদের কথাই ভাবছিলেন। আর একদিন মৃণালিনী বলেছিলেন—“বুঝলেন ঠাকুরপো, সেই নন্দী মুকুটকে চাকরী দিতেএসেছিল, মুকুট স্পর্দ্ধার সঙ্গে প্রত্যাখান করেছে, তাই ওর দোকান ডুবিয়ে দিতে কী অক্লান্ত উদ্যম ওর ; কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে ওর সব চেষ্টা। মধ্যে থেকে মুকুটকে ছোট করতে ও পরেশ ময়রাকে বড় করে দিয়েছে। শুনুন ঠাকুরপো, এবার তামাক আর সুপুরীতে কিছু টাকা পেয়েছি। আমার আশ্রমে একটা পাঠাগার আর একটা ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করে দিতে হবে। জীর্ণ স্বাস্থ্য আর সংস্কার-জর্জর মন নিয়ে গ্রামে গ্রামে মেয়েরা পশুর মত বেঁচে রয়েছে,— তাদের শিক্ষায় জ্ঞানে মানুষ করে তুলতে হবে, আত্মরক্ষার জন্যে ব্যায়াম শিক্ষা দিতে হবে।” কোহিনুর বলেছে, “দেশ থেকে তো ডাক্তার কাকা, গরু একেবারে উবে গেল, যদি কখনও সুদিন আসে, আবার আমরা ডায়েরী-ফার্ম, পোলট্রি-ফার্ম খুলবো। দোকানে দোকানে পচা তেলে ভাজা পেঁয়াজী বেগুনীর পাট উঠিয়ে দিয়ে, বোতল বোতল দুধ সরবরাহ করতে হবে।”

“ডাক্তার কাকা” ষ্টেশনে পৌঁছেছিলেন সবিতৃ,— প্ল্যাটফর্মে মুকুট দাঁড়িয়েছিল, হাতে ওর কয়েকটা চকচকে পদ্মার ইলিশ, হোটেলের জন্যে ও বুক করে আনিয়েছে।

এইমাত্র আসাম মেল বের হয়ে গেল। জনতার ভীড় পাতলা

হয়ে এল। ব্যাপারীরা ওদের মাল-মুক্তির প্রতীক্ষায় চঞ্চল প্রত্যাশায় রয়েছে। জেলেরা চায় মাছ,— ফড়িয়ারা চায় নানা সাময়িক সব্জি,— থেকে থেকে টিকিট ক্যালেকটারের হুমকীতে ষ্টেশন-প্রান্ত থরো থরো কেঁপে কেঁপে উঠছে। পোর্টার থেকে ষ্টেশন-মাষ্টার প্রত্যেকেরই দাবী,— অজ্ঞ চাষাভুষো জেলেরাও জানে রেলবাবুকে দক্ষিণা দেওয়া ওদের ধর্ম।

সবিতৃ বললেন, "মুকুট যে? মাছ নিতে এসেছিস? চল তোর হোটেলে এক কাপ গরম চা খেয়ে আসি।"

বাইসিকল থেকে নেমে সবিতৃ ওর সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন।

কুড়ি বছরের ছেলে মুকুট, লম্বা ছিপছিপে চেহারা। চোখমুখ সুশ্রী। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান না হলেও বুকের পেশী উন্নত। প্রশস্ত ললাটে অবিন্যস্ত চুলগুলি এলোমেলো ছড়িয়ে রয়েছে। পাতলা ঠোঁটে উজ্জ্বল হেসে বললো, "আপনি তো কোনও দিন হোটেলে আসেন না ডাক্তার কাকা?"

"তোর ডাক্তার কাকার কী নড়বার অবসর আছে রে? রোগীর দৌলতে যতটুকু হয়, তার বেশী আর নয়, বউদি একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাও যাওয়া হয় না।"

"আদাব, ডাক্তার সাহাব, আমার বাড়ী একবার পায়ের ধূলো দিবেন, নাতিটার বমি বন্ধ হয় না, যা খায় বমি—"

"কে রহিমআতুল্লা, কী ছাডাতে এসেছিস" সবিতৃ বললেন— "কীসের ব্যবসা সুরু করেছিস?"

করুণ হেসে রহিমআতুল্লা বললো "আমরা গরীব মানুষ বাবু, ব্যবসা করা কী চলে? মেয়ের শ্বশুর আসাম থেকে এক ঝুড়ি আনারস পাঠিয়েছিল, ছাড়াতে এসে দেখি সুতো কাটা শূন্য ঝুড়িটা পড়ে রয়েছে, বাবুরা বললো, "কেউ জানে না—"

ডাক্তার নিরুত্তর। কিছুক্ষণ পর বিকেলবেলা ওর বাড়ী যাবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার হাঁটতে লাগলেন।

মুকুট যেন উত্তাল ঝড়ের ভঙ্গিতে রুদ্র হয়ে উঠলো, "ডাক্তার কাকা, কোনও উপায়ে কী এই দুর্নীতি এই অন্যায়কে সমূলে নির্মূল করা যায় না, বেশী কিছু নয়, একটা আণবিক বোমা তৈরী করে ঘুন-ধরা মেরুদণ্ডগুলিকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করে দিই—"

প্রশান্তকণ্ঠে সবিতৃ বললেন,—"উত্তেজিত হয়োনা মুকুট, জানি তোমরা তরুণ, রক্তে তোমাদের বিপ্লবের আগুন ধরেছে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমরা বিরুদ্ধ অভিযান করবে, তবু তোমাকে ভাবতে হবে এ অন্যায় হয় কেন? সব মানুষ পৈশাচিক বৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, দৈন্য-দারিদ্র্য অভাববোধে মানুষ পিশাচ হয়, পেটভরে খেতে না পেয়ে পেয়ে সঙ্কীর্ণতার দ্বারস্থ হয়।"

উদ্দীপ্ত কণ্ঠে মুকুট বললো—"ক্ষুধার জন্যে দুর্নীতির দ্বারস্থ না হয়ে ওই ক্ষুধার দাবানলে ওরা দগ্ধ হয়ে যেতে পারেনা ডাক্তার কাকা?"

"শুন মুকুট—" সস্নেহকণ্ঠে ডাক্তার বললেন, "বিদেশী শাসনের স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতায় আর অবজ্ঞায় মানুষের চরিত্রে ঘুণ ধরে গেছে, শিক্ষা পায়নি, শিখেছে সংস্কার, জ্ঞানের আলো পায়নি ওরা, অজ্ঞতার অন্ধকার ওদের চতুর্দিকে কালো ছায়া বিস্তার করে রয়েছে। যথার্থ চরিত্র গঠন হয়না বলে সহজে অন্যায়ের ফাঁদে পা দিতে ওরা দ্বিধা বোধ করে না। নৈতিক চরিত্রের দৃঢ়তা চাই, এই আণবিক শক্তির আত্মবিকাশ ঘটুক মানুষের চরিত্রে। আমি বলবো, বৌদি একটি আণবিক বোমা, তুই আর কোহিনুর তারই উত্তম সংস্করণ।" এবার গেট অতিক্রম করছিল ওরা, বলরাম টিকিট চেক করছিল, বললো, "মাছগুলো বুঝি বুক করে আনালে, তা বেশ" গলার স্বর নামিয়ে বললো, "এত সাধুতা, ন্যায়পরতা গরীবের জন্য নয়—তার চেয়ে রেল কোম্পানীকে পয়সা না দিয়ে আমাকে কয়টা ইলিশের টুকরো দিলেই পারতে।" মুকুট তখন হোটেলের দিকে হাটতে হাটতে

খুশির উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলছে, "সত্যি কাকা, অন্যায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করবার শক্তি আমার যার কাছেই পেয়েছি। ওরা আমাকে দাঁড়াতে দেবেনা আমি দাঁড়াব, ওরা আমাকে ডোবাবে আমি সাঁতরাব, কিন্তু আমাকে ছোট করতে ওরা পারলো না, পরেশ ময়রাকে বড় করে দিয়েছে। যুদ্ধের ঘন দুর্যোগে বাজারে জিনিষ দুর্মূল্য আর দুষ্প্রাপ্য—এদের হাতের মুঠোয় কালোবাজার, ফুডকমিটির কর্তা ব্যক্তিরা, বোর্ডের প্রেসিডেন্ট দারোগা থানা, আমার শুধু ছিল নিজের জমির উৎপাদিত শস্য, আর কঠিন পণ, আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।"

সবিতৃ এবার আবৃত্তির ভঙ্গিতে প্রশান্ত আননে বললেন—

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা
আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা—"

মুগ্ধ স্মিতকণ্ঠে মুকুট বললো, "আপনি কী সুন্দর আবৃত্তি করেন কাকা।"

"মনের ভাণ্ডারকে আনন্দরসে ভরে তুলতে আমি আবৃত্তি করি।" মৃদু হেসে ডাক্তার বললেন, "পরিবারবর্গকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকারের গোলামী করি, জানি এ বৃন্ত থেকে আমাকে একদিন খসে পড়তে হবে,—জীর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে যে মানুষরা বেঁচে থাকে তাদের সুস্থ করতে আমি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাধনা করি।"

ষ্টেশনের পিছনে একটি কাঠের সাঁকো পার হয়ে ওরা হোটেলে পৌঁছল। টিনের ছাদে ঢাকা, মাটির দেওয়ালের একখানা বড় ঘর। সামনের দিকে টেবিল, চেয়ার, বাসনের র‍্যাক প্রভৃতি সুসজ্জিত। ভিতরের অংশে রান্না-ভাঁড়ার ইত্যাদি। মুকুট সবিতৃকে বসতে দিয়ে বললো, "বসুন কাকা, দিদি কোথায় গিয়েছে, ওকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি ষ্টেশনে যাবো, দার্জিলিং মেল আসছে, যাত্রী আনতে হবে।"

নয়

মুকুটের হোটেলের পাশেই পরেশ ময়রার দোকান। ভাত, ডাল থেকে লুচি মিষ্টান্ন সবই সেখানে পাওয়া যায়। দোকানের সামনে দিয়ে বোর্ডের ধূলি ধূসরিত রাজপথ। একদিকে ধূ ধূ করে অনুর্বর মাঠের পর মাঠ। পরিত্যক্ত জমি। ভারতের নিরাপত্তার জন্মে বিদেশী সৈনিকেরা একদিন এখানে অসংখ্য ক্যাম্প তৈরী করেছিল। আজ আর সে আবাস নেই, জয়ের উল্লাসে সৈন্যরা স্বদেশে ফিরে গেছে। ক্যাম্পের তারপলিন আর দড়ি বাঁশ খুঁটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। নীল রঙের তাঁবুগুলো বর্ষার জলে ধুয়ে সাদা হয়ে গেছে। হোটেলের পিছনেই বাঁধানো পাতকুয়া, দলে দলে লোক আসে, লোহার শিকলের সাহায্যে জল উঠে আসে। ওদের মধ্যে থেকে দুই বালতি জল নিয়ে কোহিনুর বেরিয়ে এল।

বাইশ বছরের তম্বী তরুণী মেয়ে, অনুজের মতই লম্বা একহারা গঠন। সুন্দরীর পর্য্যায়ে না পড়লেও মুখশ্রী-লাবণ্য ঢলঢলে। ঠোঁটের রেখাটি যেন কঠিন দৃঢ়তায় তুলি দিয়ে আঁকা। কালো-পাড় মিলের শাড়ী ওর পরিধানে ছিল, আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে রেখেছিল। সবিতৃর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে ও বালতি দুটি নামিয়ে রাখলো। ওর দিকে তাকিয়ে সবিতৃ বললেন—

"কোনও কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারী
শক্তি দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে, বিজয়লক্ষী নারী।"

"ভুল করলেন আপনি," মৃদু প্রতিবাদের কণ্ঠে কোহিনুর বললো "বলুন, উচ্চ বংশের, ভদ্রঘরের মেয়ে, বয়স্থা মেয়ে হয়ে সাধারণের

সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে জল তুলে এনে বংশের সম্ভ্রম, শিক্ষার মর্য্যাদা, নারীর লজ্জা আব্রু সব কিছু ভাসিয়ে দিলি, ডুবিয়ে দিলি।" সবিতৃ বললেন মৃদু হেসে, "মানুষের কাছে আঘাত পেতে পেতে তুই যত প্রতিহত হয়েছিস, সুদ শুদ্ধু যে আমারই উপর উসুল করে তুলছিস ?" খিলখিল করে হেসে উঠলো এবার কোহিনুর উচ্ছসিত কণ্ঠে বললো, "চলুন রান্নাঘরে, আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে চা করিগে।"

উনুনে বড় ডেকচীতে চায়ের জল বসিয়ে, ডিমের ওমলেটের জোগাড় করতে করতে বললো, "সমাজের মধ্যযুগীয় বিকৃত চেতনা, বাঁকা আভিজাত্যের দম্ভ ভেঙে গুঁড়ো করে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা আমার আছে ডাক্তার কাকা, কিন্তু আঘাত লাগে তখনই সবচেয়ে বেশী, শিক্ষিত পুরুষরা যখন নারীকে অসম্মানে অপমানে জর্জরিত করতে দ্বিধা বোধ করে না। পুরুষ আজ সমাজের কর্ণধার, সমাজকে পরিচালনা করে। এ পরিচালনার সুযোগ পেয়ে স্বার্থ সঙ্কীর্ণ চেতনাবোধের প্রভাবে নারী-জীবনকে প্রতিমুহূর্তে প্রতিহত করে। নারীকে মাথা তুলতে দেখলে ওরা রীতিমত শঙ্কিত হয়, ফণা তুলে যেন উদ্ধত সাপ বিষাক্ত নিঃশ্বাসে গর্জে ওঠে। আত্মদৈন্যের বিকৃত চেতনায়, নারীকে বিলাস-সঙ্গিনীর বেশী ভাবতে পারেনা।"

সবিতৃ বললেন, "পুরুষের এ দৈন্যকে আমি অস্বীকার করিনা, স্বর্ণরৌপ্য অলঙ্কারের যুক্ত পুরীতে নারী করিল তোমায় বন্দীনি বলো কোন সে অত্যাচারী...? তবে নারী-জীবনে রামমোহন, কেশব সেন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের জীবন সাধনাকে তুই তো অস্বীকার করতে পারিসনা ? তাঁদেরই প্রতিনিধিত্ব করতে যারা আজও নারীর মঙ্গল কামনা করেন তাঁদের তুই শ্রদ্ধা না করে পারবি না।" সত্যই নারীর শুভাকাঙ্ক্ষী পুরুষকে ওর শ্রদ্ধা করতে একান্ত ভালো লাগে। পুরুষের প্রতি ওর কোনও বিদ্বেষ বা কোনও বীতরাগ নেই। একটি আদর্শ

চরিত্রের উদার পুরুষকে ওর ভালোবাসতে একান্ত ভালো লাগে। পশুর জীবনচর্চার সামিল নিছক প্রেমচর্চা ওর ভালো লাগে না। পুরুষের বলিষ্ঠ জীবন সাধনায় ওর কর্ম উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে ভালো লাগে। কিন্তু ওর মানস কুঞ্জের স্বপ্ন-দেবতা কোথায় ও জানে না, নারী-ভাগ্যের সব চেয়ে বেদনার এই যে, মননশীলতায় প্রজ্ঞায় মহান চরিত্রের পুরুষরা নারীকে অনুকম্পা করে কিন্তু নারীকে সমগোত্রীয়ের সম্মানে গ্রহণ করতে পারে না। নীরবে কোহিনুর সবিতৃর খাবার গুছাতে লাগলো।

সবিতৃ বললেন,—"কী রে আমার কথাটা বুঝি তারিফ করতে পারছিস না ?"

হাসিমুখে কোহিনুর ওঁর সামনে বিস্কুট সহ ডিমের ওমলেট আর ধূমায়িত চা-এর পেয়ালা রেখে বললো, "তারিফ না করে কী পারি কাকা, তারই মূর্তিমান প্রতীক আপনি তো সামনেই রয়েছেন।"

উচ্চকণ্ঠে হেসে সবিতৃ বললেন, "অত আমাকে বড় করিসনিরে, তোদের মেয়েদের জন্যে আমি তো কিছুই করতে পারিনা।"

বড় ডেকচীতে ডালের জল বসিয়ে দিয়ে অনুযোগের কণ্ঠে কোহিনুর বললো, "শুধু করতে পারেন না নয়, কত কাছে আমরা থাকি, এদিকে আসেন না কখনও ?"

চা এ একটি চুমুক দিয়ে ডাক্তার বললেন, "আসিনা কেন জানিস তোরা মেয়েরা বড় স্নেহশীলা, বড় মায়ার বাঁধনে বেঁধে ফেলিস, কিন্তু বাঁধন যে আমার জন্য নয় রে কোহিনুর—"

সবিতৃ মৃদু মৃদু হাসছিলেন, তাঁর হাসির দিকে তাকিয়ে কোহিনুরের চোখদুটিতে বেদনার ছায়া ঘনীভূত হয়ে এল। বললো, "লাবণ্য বউদির কাছে আপনার কথা শুনেছি, বিদ্যুৎদা আর মুকুট এক ইস্কুলে পড়েছিল, বয়সের তফাৎ ওদের মধ্যে থাকলেও মন এক সুরে বাঁধা, লাবণ্য বউদি আপনাকে—"

"থাক ও প্রসঙ্গ রে।" ওকে থামিয়ে দিয়ে সবিতৃ বললেন, "আমি জানি লাবণ্য আমাকে ভালোবাসে, তোর মা আমাকে স্নেহ করেন, তোরা আমাকে শ্রদ্ধা করিস, তাই তোদের থেকে দূরে থাকাই যে আমার একান্ত সাধনা।" চা-এর কাপটায় এবার নিঃশেষে চুমুক দিলেন সবিতৃ। কোহিনুরের ম্রিয়মান মনের পরিধি ঘিরে একটা অব্যক্ত স্তব্ধতা নেমে এসেছিল,—বাকশক্তি মূক।

সবিতৃ প্রসঙ্গান্তরে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে বললেন, "যুদ্ধ মিটে গেল, মানুষের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল। লাখো লাখো মানুষ গাছের পাতার মত ছাঁটাই হয়ে ফিরে আসছে। একটু চেষ্টা করলেই হয়তো লোক পেতে পারবি, এত পরিশ্রমে তোদের এনার্জি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

"আমার এনার্জির কথা ভেবে আমিও বড় নিরাশ হয়ে পড়ি কাকা" একটু উত্তেজনার সঙ্গেই কোহিনুর বললো, "যারা আজ যুদ্ধ-ফেরৎ ছাঁটাই হয়ে ফিরে আসছে তাদের সঙ্গে আমরা কোনও সহযোগিতাই করব না; তারা শুধু অন্যায় করেনি, মহাপাপ করেছে। একদিকে ইংরাজদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, আর একদিকে নিজের দেশের মাটি শস্য, সম্পদ সব কিছু হেলায় তুচ্ছ করে ক্ষণিকের প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়েছে। কিষাণ, মজুর অভাবে কত ধান, কত শস্যের যে অপচয় ঘটেছে, তার হিসাবনিকাশ কে আর কত রাখতে পেরেছে? মানুষ-অভাবে কত শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে অকালমৃত্যু ঘটেছে, তার ক্ষতি কোনওদিনই শেষ হবার নয়। সবিতৃ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছলেন। বললেন "তুই তাহলে আমাকেও তো ক্ষমা করবিনা কোহিনুর, আমিও তো মিলিটারী।"

উচ্ছসিত কণ্ঠে কোহিনুর হেসে উঠলো, বঁটি পেতে ইলিশমাছের আঁশ ছাড়াতে ছাড়াতে বললো, "বাধ্যতামূলক আর স্বেচ্ছাকৃত দুটি কাজ আলাদা, ডাক্তার কাকা, আপনি চাকরী করেন ইংরাজকে বিপদে

ফেলে পালাবেন না—চুক্তিপত্রে সই করে আপনাকে শপথ গ্রহণ করতে হয়েছে, আর ওরা? ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে।"

"ওরা বড় গরীব কোহিনুর, তাই লক্ষ টাকার স্বপ্ন না দেখে পারে না।" সবিতৃ উঠে দাঁড়িয়ে আরও যেন কী বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে কোহিনুর বললো, "না, ওদের অন্যায় ক্ষমা করবার নয়, যেদিন আমাদের হোটেল মানুষ অভাবে একেবারে ডুবতে বসেছিল সেইদিন আমি মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছিলুম। আমাদের সংসারে একটা মেথরাণীর যা স্বাধীনতা আছে, আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের তা নেই। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাবে, চালের অভাবে চুল্লি নিভে যাবে, তবু বাধা-নিষেধের গণ্ডি অতিক্রম করে বাইরে বের হতে পারবে না। এরই নাম কী স্ত্রীলোকের আব্রু? নারীর সম্ভ্রমবোধ?" ইতিমধ্যে ওর মাছগুলো টুকরো টুকরো করে কাটা হয়ে গেছলো।

প্রশান্ত আননে স্মিত হেসে সবিতৃ বললেন,' "উত্তাল ঝড়ের মুখে সেদিন তুমি মুকুটের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলে, তাই না তরী ডুবে যেতে পারেনি—

জগতে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

এই সময় বেকারীর জানালার মধ্যে দিয়ে একটা মানুষের মুখ দেখা গেল। লাইনের শ্রমিক সে, ফিস ফিস করে বললো, "আবার আমার পাঁচদিনের হাজিরা কেটে নিয়েছে দিদিমণি? পুলিশের দরখাস্তখানা লিখে রেখেছেন?" ওর দিকে কুঞ্চিত ভ্রূকুটি তুলে তাকিয়ে কোহিনুর বললো, "আবার দোকানে এসেছিস? বলেছি না রাত্রিতে বাড়ী যাবি, জানাজানি হয়ে যাবে।" মুহূর্তেই লোকটি জানালা থেকে সরে গেল।

মৃদু হেসে সবিতৃ বললেন, "জানাজানি হয়ে গিয়েছে কোহিনুর,

আজ মিঃ মজুমদারের ভগ্নীকে দেখতে গেছলুম, মিঃ মজুমদার তো ভীষণ রেগে রয়েছেন। বললেন, "শ্রমিকগুলো Uncontrolable হয়ে গেছে। Deffence of India Act-এর কবলে তোকে ফেলবেন।"

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো কোহিনুর। মৈনাককে সে দেখেছে, বাইরে থেকে মনে হয় অত্যন্ত অসহায় ভাবাপন্ন যেন চাকরী করবারও ওর ক্ষমতা নেই। কোহিনুরের হাসি কিছুতেই থামতে চায়না, নারীর কাছে পুরুষের পরাজয়, যত ভাবে হাসিতে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে।

সবিতৃ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন। অসংখ্য কাজ, অগুণতি রোগীপত্র, সরকারী চাকরী; ঘন ঘন তিনি প্যাডল্ করতে লাগলেন।

প্ল্যাটফর্মে দার্জিলিং মেল প্রবেশ করেছে। মুকুট কতকগুলি যাত্রীসহ ওর হোটেলের দিকে এগিয়ে আসছে।

দীর্ঘ কয়েকদিন অতিক্রম করলো, পিতার পত্রের উত্তর দেওয়া হয়নি এখনও।

উত্তর কী-বা লিখবেন? তবু একটা লিখতে হয় বৈকি। ডিসপেন্সারী থেকে ফিরে সবিতৃ চিঠি লিখছিলেন, আসন্ন সন্ধ্যার ধুসর ছায়ায় দিগন্ত ঘনায়মান, জংসনের কলরব মুখর হয়ে উঠেছে, 'নারায়ণগঞ্জ, আমিনগাঁও,' ট্রেনখানা আজ বেশ দেরিতে পৌছলো, নিশ্চয় ষ্টীমারের বিভ্রাট ঘটেছিল নদীতে, এদিকে 'নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস আগেই বেরিয়ে গিয়েছে, আজ আর যাত্রীদের দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই।

ডাক্তার চিঠি লিখছেন.—রুনু সুন্দরী মেয়ে, শিক্ষিতা মেয়ে ওর পাত্রের অভাব কী? রমেশ কাকাকে বলবেন, রুনুকে যেন তিনি সৎপাত্রে অর্পণ করেন।

"এইটে কী ডাক্তার মৈত্রের কোয়ার্টার?"

চিঠি লেখা থামলো ডাক্তারের, অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠস্বর। উৎকর্ণ

কান পেতে সবিতৃ শুনলেন, রুম্নু তখন দেবুকে জিজ্ঞেস করছে, "তিনি কী এখন বাড়ী আছেন?" দেবু ততক্ষণে রুম্নুকে চিনেছে, "ওমা রুম্নু দিদিমণি যে, দাদুবাবু কে এসেছেন দেখ"

রুম্নু ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে, সবিতৃ তক্তাপোষের এক ধারে বালিশে কনুই রেখে চিঠি লিখছেন; বিস্ময় আর আনন্দমাখা চোখ তুলে তাকালেন, মৃদু হেসে বললেন, "রুম্নু, তুমি? বসো।"

ঘরে আরও খান দুই চেয়ার ছিল, রুম্নুর তক্তাপোষের আরেক প্রান্তেই বসতে ভালো লাগলো।

সবিতৃ ভাবছিলেন প্রায় বছর ছয়েক পর রুম্নুকে দেখলেন, একহারা ফর্সা রঙের মেয়ে রুম্নু, ইদানিং একটু ক্লিষ্ট হয়েছে, একটু শীর্ণ হয়েছে। কয়েকটা ডিগ্রী পাবার পর মেয়েদের যা হয়ে থাকে আর কী।

ইতিমধ্যে রুম্নু ভেবে নিয়েছে, সবিতৃদা বড় রোগা হয়ে গিয়েছে। সে সুন্দর চেহারা আর নেই।

উৎসাহ প্রকাশ করে সবিতৃ বললেন, "কতদিন পর তোমাকে দেখে ভারী আনন্দ হচ্ছে। দেবু, দিদিমণির জন্যে চা কর, চায়ের সঙ্গে কী দিবি রে? যে ভবঘুরে আমরা! ঘরে কী কিছু আছে? শোন, গরম দুটি চিঁড়ে ভাজা—"

দেবু এবার ঝোপ বুঝে কোপের আঘাত হানবার সুযোগটা ব্যর্থ হতে দিল না। বললো, "তোমাকে ভবঘুরে থাকবার কে দিব্যি দিয়েছে বলতো, বউ কী কারও মরে না? ঘর কী কেউ আবার বাঁধে না?"

হেসে উঠলেন ডাক্তার স্বভাবসুলভ উচ্চ হাসি। "তুই থাম দেবু, যা, চা আর চিঁড়ে ভাজা নিয়ে আয়।" বুকের সঙ্গোপনে রুম্নুর একটা ভারী নিঃশ্বাস পুঞ্জিত হয়ে উঠেছে, কিছু অনুযোগ প্রকাশ করেই সে বলে ফেললো, "না, সবিতৃদা হাসি নয়, কী তোমার চেহারা

হয়েছে, বলতো? এই দুর্যোগের মধ্যে আর একজনকে ডেকে আনলে, সে যে আমারই রুটি থেকে ভাগ নিয়ে আমাকে আরও চিমসে করে দেবে রে।"

"কী যে বলো তুমি।" রুমু এবার না হেসে পারলো না। বললে, "না-হয় তোমার খাবার থেকে ভাগই দিলে, তাই বলে মেয়েদের স্নেহের বাঁধনকে তুমি অস্বীকার করতে পারো না—"

"স্নেহের বাঁধন" আবার হাসির উদ্দাম জোয়ার—'তাই বুঝি রুমু তুমি ছুটে এলে আমায় স্নেহের ফাঁস পরিয়ে দিতে।"

রুমু এবার রেগে উঠেছিল, বললো "আমার তো বয়ে গিয়েছে, তোমাকে স্নেহের ফাঁস পরাতে যাবার, কারুর গলার ফাঁস হবার জন্যে আমি বসে নেই যেন। ঢাকায় একটা মেয়ে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস, গরমের বন্ধে বাড়ী ফিরছিলুম, ষ্টিমার দেরীতে এল, গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। রাত কোথায় কাটাই, তাই তোমার বাড়ী এলুম। পুঞ্জ পুঞ্জ অভিমানে রুমুর কথাগুলি বেদনা-অভিসিক্ত শোনালো।

ডাক্তার বিব্রত বোধ করলেন "রুমু রাগ করলে? সত্যি রাগ কোরনা, তুমি এসেছ, আমি যে কত খুশি হয়েছি তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না।"

রুমু এবার ফিক করে হেসে ফেললো, "ছোটবেলায় কম জ্বালিয়েছ, কম কাঁদিয়েছ।"

সবিতৃ বললেন, "তুমি যখন কাকার কাজের উপলক্ষে দূরে চলে গেলে এত খারাপ লাগতো কী বলবো তোমাকে, তোমাকে রাগাতে না পেরে ভারী অস্বস্তি বোধ করতুম আমি।" দেবু চিঁড়ে ভাজা দিয়ে গেল, ওকে রাত্রের জন্যে ভুনি খিচুড়ী করতে বলে আবার গল্পে মন দিলেন।

দীর্ঘদিনের কত কথা। ছয়, সাত বছরের মধ্যে কত ঘটনা ঘটেছে, গল্প করতে করতে অনেকটা সময় অতিক্রম করলো। দেবু এসে

বললো, "তোমাদের কী গল্প ফুরোবে না? রাত দশটা বাজে, খিচুড়ী যে ঠাণ্ডা হয়ে এল।"

"ও: তাইতো" ডাক্তার ত্রস্ত পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেবুকে বললেন, "তুমি খাবার দাও, আমরা এখুনি আসছি, এবার তিনি রুমুর হাতে লণ্ঠন তুলে দিয়ে বললেন, "ওই দেখ স্নানঘর, তুমি এবার হাতমুখ ধুয়ে এস, কিন্তু কই তোমার বাক্স বিছানা তো দেখলুম না।"

"বাক্স-বিছানা," লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় রুমু কয়েক মুহূর্ত ডাক্তারের সৌম্য মুখের দিকে তাকালো, ঠোঁটে ওর কৌতুক হাসি, "সন্ন্যাসী ঠাকুরের বাড়ী বাক্স-প্যাটরা নিয়ে হাজির হতে ভয় পেলুম, কে জানে নারীর প্রবেশ অধিকার যদি অবাধ না হয়, সাধু মানুষের ব্রহ্মচর্য যদি ভেঙ্গে যায়, ষ্টেশনে কুলীর পাহারাতে রেখে এসেছি, ভোরের আসাম মেলে ফিরবো কিনা—"

এবার ডাক্তার একটু আন্মনা হয়ে গিয়েছিলেন, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী কত না বিশেষণে এরা আমাকে বিভূষিত করে, পরমুহূর্তে স্বভাবসুলভ স্নেহমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, "এবার সে ভুল তোমার ভাঙ্গলো তো রুমু, আমি সাধুও নই, সন্ন্যাসীও নই, নিছক সাদাসিদে এক মানুষ; শোন, তুমি অত সকালে ফিরবে কেন? কাল বেলা একটার গাড়ীতে যেও, কতদিন তোমার রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনিনি বলতো? সেই গানটা কী চমৎকার গাইতে—আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে ফুল ফুটবে।" রুমু নিরুত্তর, কী যেন নিঃশব্দে ভাবতে লাগলো।

"চুপ করে রইলে যে," সবিতু বললেন, "আপত্তির কী আছে? আজ এখন ওয়েটিং রুম বন্ধ হয়ে গেছে, কাল তোমার জিনিষগুলো আনিয়ে দেব।"

"আপত্তির আর কী আছে?" রুমু ভাবছিল, বললো তাই হবে সবিতুদা ও স্নানের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

"চুপ করে রইলে যে রুনু, আপত্তির কী আছে তোমার ?"

ডাক্তারের এই স্নিগ্ধ সম্ভাষন রুনুর শ্রুতিমূলে অনুরণিত হয়ে ফিরতে লাগলো। রাত্রি এগারটায় বিছনায় ও ঘুমুতে এসেছে, ক্রমে বারোটা, একটা দুইটা বাজলো, কিন্তু ঘুমুতে এসেছে, চোখের তারকায় ঘুমের আমেজ বুঝি কেটে যায় কানের পর্দ্দায় মিষ্টি এক সুরের মূর্ছনায়।

"আপত্তির আর কী আছে তোমার ?"

সত্যি আপত্তি কী থাকতে পাবে রুনুর ? সবিতৃদার যত্ন আপ্যায়নের বুঝি তুলনা হয়না। নিজের বিছানায় পরম স্নেহে নূতন শয্যা নিজে হাতে রচনা করে দিলেন, কত নিখুঁত পারিপাট্যের সঙ্গে, না নিজে হাতে মশারীটা পর্যন্ত গুঁজে দিয়ে বললেন, "দেখো মশা যেন না ঢোকে, বড্ড ম্যালেরিয়া।"

এত স্নেহ, এত ভালবাসা ? তবু কেন রুনুর চোখে ঘুম আসে না, রুনু বুঝতে পারে না। একটা ক্লান্তি ও অবসাদ বুকের মধ্যে অনুভব করে, কী যেন ব্যর্থ প্রত্যাশায় পুঞ্জ পুঞ্জ নিশ্বাস ভারী হয়ে ওঠে। টর্চ বাতি জেলে ও হাতঘড়ি দেখলো, তিনটে বাজতে আর দেরী নেই, ও বিছানা থেকে নেমে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল, বাইরে থমথম করছে, মিশমিশে কালো অন্ধকার রাত্রি, আকাশে অগণিত নক্ষত্র দপদপ করে জ্বলছে। পাশের ঘরে একটা ক্যাম্প খাটে সবিতৃ অঘোরে ঘুমুচ্ছেন, তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ রুনু কান পেতে শুনলো।

অনেকটা সময় অতিক্রম করলো, তবু রুনু দাঁড়িয়ে রইল জানালার ধারে।

চোখ মেলে হয়তো দেখছিল আকাশের অগনিত নক্ষত্র, ডাক্তারের নিশ্বাসের শব্দ কাণের পর্দায় বিচিত্র রাগিনী সৃষ্টি করেছিল। ক্রমে রাত শেষ হয়ে আসে, দিগন্তের আড়ালে সূর্যের আভাষ জাগে।

পাখীর সুমিষ্ট কলকাকলী কূজন তোলে ভোরের মৃদু বাতাসে। পাখীর কূজন ঘুম ভাঙায় ডাক্তারের প্রত্যহ। আজও তিনি প্রত্যহের মত বিছানায় উঠে বসলেন। হঠাৎ সামনের ঘরের জানালায় রুনুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ক্যাম্প খাট থেকে নেমে এগিয়ে এসে বললেন, "এত সকালে উঠেছ রুনু? রাত্রে বুঝি ভালো ঘুম হয়নি?"

"অনেক ঘুমিয়েছি সবিতৃদা," রুনু বললো, "ভোরে উঠে পড়লুম, আসাম মেলেই আমাকে ফিরতে হবে, কাল পৌছনোর কথা ছিল, আজও না গেলে···।"

"সে কী তোমার গান শোনা হোল না যে।"

ইতিমধ্যে বাইরে কুলী এসে ডাকলো, "দিদিমনি, মাষ্টারবাবু খবর দিল মেলের ঘন্টি হয়ে গিয়েছে।"

"ঘন্টি হয়ে গিয়েছে, চল যাচ্ছি।" রুনু হাতঘড়ি, চটি জুতোর খোঁজে ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

"তুমি সত্যি চলে যাবে রুনু।" ডাক্তার অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছেন, রুনুর প্রতি তাঁর কী কোনও যত্নের ত্রুটি হয়েছে? তিনিও সার্টটা গায়ে চড়িয়ে ওকে ট্রেনে তুলে দিতে এগিয়ে গেলেন।

ষ্টেশনে ট্রেন পৌছে গেছলো, মাত্র দুই মিনিট দাঁড়ায়, রুনু ইণ্টার ক্লাশ মেয়েকামরায় উঠে কুলীকে পয়সা গুনে দিচ্ছিল। ডাক্তার দেখলেন, ওর মুখটা আষাঢ়ের মেঘের মত থমথম করছে। বললেন, "স্কুল খুললে যখন ফিরবে আবার এস রুনু।"

মৃদু হাসলো রুনু, গাড়ী পা-পাঁ করে চলছে। বললো, "এবার তোমার যাবার পালা সবিতৃদা, আসছ তো?"

"নতুন ধান উঠলে যাব।" ডাক্তার উত্তর দিলেন।

দশ

সবিতৃ হাটে গিয়েছিলেন, কিন্তু দুধের দর তিনি নামাতে পারেন নি। দুই চক্রান্তের ব্যূহ ভেদ করতে গিয়ে আঘাতই পেয়েছেন, লাঞ্ছনা আর অপমানে জর্জরিতই হয়েছেন।

দুঃখ তিনি করেন না, বিশ্বাস করেন তিনি মানুষেব চরিত্র নীচে নেমে যায় দারিদ্র্য আর অজ্ঞতার জর্জর অভিশাপে। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ তখন আত্মরক্ষা করতে গিয়ে আত্মবঞ্চনা করে।

আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই, অভাবের সীমা নেই, শেষ পর্যন্ত ওরা ঘোলাটে কাদার পাঁকেই ডুবে যায়। এরাই মুকুটের বাবা প্রতুল লাহিড়ী, টিকিট কালেকটার বলরাম মল্লিক। তবু এদের ক্ষমা করা যায়। দারোগা খবর পাঠিয়েছিল সে অসুস্থ। বোর্ডেব প্রেসিডেণ্ট বলেছিলেন, হাটে গিয়ে ব্যাপারীদের হাতে জখম হবার সাধ তাঁব নেই।

নির্মম স্বার্থপরতার নগ্ন আত্মপ্রকাশ, বিকৃত চেতনার কুৎসিত অনুকৃতি। ওরাই সমাজের ধুবন্ধব আর পবিচালক, গ্রামের মানুষদের ওদেরই উপর সুখস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভব করে জীবন ধারণ করতে হয়।

নিজের দেশের প্রতি মানুষের প্রতি, মাটিব প্রতি একটু স্নেহ একটু করুণা কী ওদের মনকে বিচলিত করে না?

দাসত্ব যে জঘন্য, তা অস্বীকাব করবার নয়। দাসত্বের পায়ে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পন করা যে আরো জঘন্য।

কয়েকদিন পর সবিতৃ একখানা বেনামী চিঠি পেয়েছিলেন। রুলটানা খাতার পাতা ছিঁড়ে ঘন নীল রঙের কালীতে লেখা ম্যানিনেমাস পত্র। চিঠির ভাষা এই রকম:

'ডাক্তারবাবু, আপনি দুধের দর নামাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। ইহার পর যদি মিষ্টান্ন তৈয়ারী বন্ধ করিতে উদ্যোগী হন জন্মের মত আপনাকে এই স্থান নহে, ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে।'

স্তম্ভিত ডাক্তার সবিতৃর হাত থেকে চিঠিখানা কখন যেন খসে পড়ে গেছলো,—থানা, দারোগা, কনেষ্টবল প্রত্যেকটি লোককে যখন করতলগত করেছ, ধূলির ধরণী থেকে একটা মানুষকে অপসারণ করা এমন আর বিচিত্র কী? সবিতৃ ভাবতে ভাবতে যেন আত্ম-সমাহিত হয়ে গিয়েছিলেন। "কোথায় তুমি বিবেকানন্দ, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, আশুতোষ, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ যে ঊর্দ্ধলোকে কিম্বা স্বর্গ-লোকেই থাক না কেন; আর মন্ত্র নয়, বানী নয়, বেদান্ত হাতে নিয়ে নেমে এস, আঘাতে আঘাতে ওদের সুপ্ত আত্মাকে জাগিয়ে তোল, জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ কর।"

লাবণ্যর মেয়ের জন্যে দুধের স্বপ্ন বুঝি সবিতৃর তখনও খান-খান হয়ে ভেঙ্গে যায়নি। অন্ধকারের অতল রহস্যে আশার স্তিমিত শিখা ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল। আসন্ন মৃত্যুমুখী রজনীর স্ত্রীকে তিনি বাঁচিয়ে তুলতে পারেন নি। ওষুধ গলাঃধকরণেরও তার আর ক্ষমতা ছিল না।

রজনীর সংসারে আর কিসেরই বা আকর্ষণ? কার প্রতি প্রীতি-মমতা? স্মরণীয় মন্বন্তর তার সর্বস্ব গ্রাস করেছে? শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকেও চিতার রাঙা আগুনের শিখায় নিঃশেষে সঁপে এল। বিবাগী হয়ে তীর্থে বিদায় নেবার সময় ছয়মাস অন্তঃসত্তা গরুটি ডাক্তার সবিতৃকে দিয়ে গেছলো। বিদায়কালে তাঁর পায়ের ধুলো সাদা চুলগুলিতে মেখে নিয়ে, হাতের উল্টো পিঠে চোখের জল মুছে বলেছিল, "বাবু গো, কলির ধর্ম এই, যারা অন্যায় করে, বারে বারে তাদেরই জয় হল। বিদ্যুৎবাবু সন্ধ্যাবেলা গাঁয়ের চাষাভূষো রেলের মজুরদের নিয়ে খবরের

কাগজ পড়ে শোনায়। শুনতে শুনতে এই কথাই মনে হয়, সত্যের বিচার কী কোনওদিন হবেনা ঠাকুর? আর কত দুঃখ অভিশাপ মানুষ সহ্য করবে?"

বেদনার নিঃসীম অন্ধকারেও সেদিন ডাক্তারের প্রাণে একটু আনন্দের দীপশিখা জ্বলে উঠেছিল। এবার সত্যই বুঝি জাতির দুর্ভাগ্যের আকাশে সোনালী সূর্য ঝলমল করে উঠবে। চাষাভূষো, দিন-মজুররাও জাগতে সুরু করেছে, এরই নাম গণ-জাগরণ। সাম্রাজ্যবাদীদের আসন এবার টলে উঠবে। নতুন দিনের আলো আসবে একদিন,—নতুন মানুষ, নতুন জীবন।

রজনী নিজেই লাবণ্যর কোয়ার্টারে জবাকে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। মস্ত বাচ্চা দেবে জবা এবার, ছয়ক্রোশ পথ হেঁটে গিয়ে সে মাতৃত্বকে বহন করে এনেছিল। লিনলিথগোর উপহার। সবিতৃ ভাবেন সেদিনের বড়লাটসাহেবের অনুকম্পার তুলনা হয় না!

জবা মস্ত বাচ্চা দেবে, কিন্তু রজনীর স্ত্রী কই? যে জবার বাচ্চার দিকে তাকিয়ে নিজের সন্তানের বিয়োগ বেদনা বিস্মৃত হতে চেয়েছিল। মাথা গোঁজবার শেষ সম্বল টিনখানা বেচেও কালোবাজারে রজনী স্ত্রীর ঔষধ সংগ্রহ করতে পারেনি।

অথচ খুব বেশী দূরে নয়, এই বাংলা দেশেরই প্রান্তে আসাম প্রদেশে বৈদেশিক ফৌজ-মহলে রাশি রাশি অব্যবহৃত ওষুধপত্র পুড়িয়ে ফেলা হোল, একফোঁটা ওষুধ মানুষ পায়নি সেদিন, পুড়ে সব ছাই হয়ে গেল।

বিদেশী সৈন্যরা সাম্রাজ্যবিজয়ের আনন্দে দেশে ফিরে চলে গেল। ডাক্তার সবিতৃ লাবণ্যর বাসার দিকে যাচ্ছিলেন। জবাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, একটি গোয়াল-ঘরের ব্যবস্থা না করতে পারলে লাবণ্যর মেয়েকে সুস্থ করতে গিয়ে, বাড়ীশুদ্ধ মানুষকে হত্যা করা হবে। ওই

সঙ্কীর্ণ ছোট্ট কোয়ার্টারের স্বল্প পরিসরে মানুষ গরু এক হয়ে মিশে যাবে। কয়েকজন মজুর বাঁশ খড় দড়ি পেরেক ইত্যাদি নিয়ে আগে রওনা হয়েছিল। ওদের অনুসরণ করে সাইকেলে প্যাডল করতে করতে সবিতৃ কতকটা আপন মনে বললেন, "একদিকে মানুষ ওষুধ পায় না, পট পট করে পোকার মত মরণকেই আলিঙ্গন জানায়, আর একদিকে স্তূপাকার দুর্লভ ঔষধ রাঙ্গা আগুনের শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যায়।" দাঁতে দাঁত ঘসে ডাক্তার বললেন,—"Scorebed-earth policy—পোড়ামাটীর নীতি।"

এগারো

লাবণ্য রাজবন্দী মণ্টুর সেলাই-এর কলে কয়েকটা জামা সেলাই করছিল। চরকায় কাটা সুতোর তাঁতে তৈরী কাপড়, সাদা ধবধবে খদ্দর, কিছু কাপড় আসাম থেকেও এসেছে। খট-খট-খট একটানা ছুঁচ আর মেসিনের শব্দ। ফতুয়া, কামিজ, পা-জামা, ফ্রক ইত্যাদি তৈরী করছে লাবণ্য।

পঙ্গু খুকি একটু ভালো হয়েছে, নূতন শিশুব চলার ছন্দে পা-পা হাঁটতে পারে। একটা পা পায়ের উপর তুলে শুয়ে গুনগুন করে গান গাইছিল :

'ডাক্তার মামা গাই দিয়েছে,
অসুক আমার সেরে গেছে,
বাটী বাটী দুধ খাব,
ভাল ভাল শাড়ি পরবো।"

ইত্যবসরে উঠানে সবিতৃকে দেখতে পেয়ে লজ্জায় চোখের উপর হাত চাপা দিল। সবিতৃ হাসিমুখে বললেন, "লজ্জা কেন খুকু, বেশতো, থামলে কেন?"

লাবণ্যর দিকে এবার তাকালেন, "তোর মেয়ের কিছুটা ইম্‌প্রুভ হয়েছে, নয়রে লাবণ্য?

এগিয়ে এসে লাবণ্য একখানা পিঁড়ি পেতে দিয়ে বললো, "বোস দাদা, তুমি যখন ভার নিয়েছ, তখন ওর ভালো না হয়ে উপায় আছে? প্রতিজ্ঞা ছিল তোমার কালোবাজারকে প্রশ্রয় দেবেনা, অথচ খুকির জন্যে তোমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গলো।"

মৃদু হেসে সবিতৃ বললেন, "ডাক্তারদের প্রতিজ্ঞা করা চলেনা রে, জীবন নিয়ে কারবার।"

"অদ্ভুত মানুষ তুমি, অদ্ভুত তোমার মন, অদ্ভুত তোমার পণ; দুধের ব্যবস্থা করতে পারলে না, গরু সংগ্রহ করলে তবে তুমি বাড়ী এলে।" গলার স্বর ভারী হয়ে এল লাবণ্যর, "তোমার সঙ্গে কী আমার শুধু কর্তব্যেরই সম্বন্ধ! স্নেহ, ভালোবাসা, আত্মীয়তা—"

ভালোবাসা, আত্মীয়তা, স্নেহ, সত্যি আমি অদ্ভুত মানুষরে লাবু; রুনু এসেছিল, হয়তো সে রাগ করে ফিরে গেল।"

রুনু এসেছিল, লাবণ্য বিস্ময়ের আতিশয্যে কথা বলতে পারল না।

ডাক্তার বললেন, "ঢাকা থেকে বাড়ী ফিরছিল, ট্রেনের কানেকসন পাইনি, রাতটা আমার বাসাতেই থাকলো, হয়তো কোনও ত্রুটি ঘটেছিল, ভোরের ট্রেনেই চলে গেল।"

লাবণ্য বললো, "তোমার যত্নে ত্রুটি থাকতে পারেনা, দাদা। রুনুদির হয়তো কোনও দুর্বলতা, হয়তো তোমার কাছে আরও কিছু প্রত্যাশা নিয়ে সে এসেছিল।"

"থাম তুই," ডাক্তার প্রসঙ্গান্তরে যাবার উদ্দেশ্য নিয়েই বললেন, "এতদিন মেয়েটাকে দেখতে আসতে পারিনি।"

সশব্দে হেসে উঠলেন সবিতৃ, প্রাণখোলা হাসি, "বিশ্বাস কর, তুই একটুও সময় করতে পারিনি, আমাদের ডিষ্ট্রীক্ট সাহেব আমার বিরুদ্ধে একখানা য়্যানিনেমাস চিঠি পেয়েছেন। আমি নাকি সরকারী কাজ-কর্ম করিনা, কেবল প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে বেড়াই, সরকারী ওযুধপত্র দাতব্য করি। সাহেব আমাকে সতর্ক করে দিয়ে একখানা চিঠি দিলেন। সেই থেকে সরকারী কাজ করেও সময় থাকলে ডিস্‌পেন্সারীতে বসে কড়িকাঠ গুনি।"

উত্তেজিত কণ্ঠে লাবণ্য বলে উঠলো, "তুমি সাহেবের সঙ্গে দেখা

করলে না কেন? অন্যায় অপবাদ তোমার স্বীকার করে নেওয়া উচিত নয়।"

"সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলুম রে।" বিশীর্ণ হেসে সবিতৃ বললেন, "সাহেব কী বললেন জানিস—"Shame, they are your fellow-brothers," আমি তো লজ্জায় মাথা তুলতে পারিনি। বললুম "এ চিঠি বাইরে থেকে কেউ দিয়ে থাকবে।"

বিদ্রূপের কণ্ঠে হেসে উঠলো সাহেব, "Impossible, বাইরের লোক দিতে পারে না, কারণ তারা ডাক্তার পাবেনা, তাদেরই ক্ষতি! But I interfere to your work, I strictly observe the administrative discipline."

"ভিকট্রি-লিভ তুদিন পেয়েছিলুম, গোয়ালটা করে দিতে এলুম, খুকীকেও কতদিন দেখিনি"।

লাবণ্য বললো, "তোমাদের সাহেব অনেক ভদ্র, আর আমাদের? একদিন ডিউটিতে জয়েন করতে দেরী হয়েছিল, য়্যাবসেন্ট করলো। মাইনে কাটা গেল, উনি বড় সাহেবকে জানিয়ে দরখাস্ত দিলেন, কিন্তু একই ছাঁচে ওদের জীবনের সুর যেন বাঁধা; কোনও প্রতিবিধান হোলো না।"

"একই সুরের অনুরনণ, বৃটিশ সাম্রাজ্যকে দেউলে করতে আমি সম্রাটের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিনি।"

সবিতৃ বললেন, "এরই মধ্যে আমাদের সাহেব একটু ব্যতিক্রম! মনুষ্যত্ব, হৃদয়বোধটুকু এখনও বিসর্জন দিতে পারেনি। মৈনাক মজুমদার যে হৃদয়বোধকে বিসর্জন দিয়েছে তা আমি বলিনা। মানুষটি অত্যন্ত সিম্পল্ হার্টের, তবে চাকরীর প্রতি অত্যন্ত মমত্ববোধ, অহেতুক আশঙ্কা। এই দাসত্বের চক্রান্তই ওকে হত্যা করবে।"

"সে হত্যাকারী যদি কেউ হয়, ওরই কেরাণী হরিসাধন," "লাবণ্য

বললো, "অত্যন্ত চতুর লোক সে, চোরকে চুরি করতে বলে, আবার গৃহস্থকে সাবধান হতেও বলে।"

"কেরাণী জীবনের এই দুমুখো-সাপের নীতি যে তাদের ধর্ম, আদর্শ লাবণ্য।" সবিতৃ বললেন, "রাজা যেমন মন্ত্রী-সভার কলের পুতুল, উর্ধবতন কর্তৃপক্ষও তেমনি কেরাণীর হাতের পুতুল। Adminstration-এর Rules and Regulation ওদের নখ-দর্পণে। Adminstration-এর discipline রক্ষার নামে ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষাই বড় হয়ে ওঠে।"

লাবণ্য বললো, "হরিসাধন বাবু শ্রমিকদের অন্তরঙ্গ হয়ে বলবেন, "তোরা বেশী কাজ করবিনা। কিন্তু সাহেবকে বলবে ওদের Absent করে দিন। প্রায় দিনের বেতন ওদের কাটা যায়, অর্ধেক র‍্যাশান ছেড়ে দিতে হয়, হরিসাধন জিনিষগুলো নিয়ে চোরাবাজারে কারবার করেন।"

এবার হাসলেন একটু সবিতৃ, "এবার দেখ, আবার আমরা সেই একটা জায়গাতে এসে উপস্থিত হলুম অর্থনৈতিক সমস্যা। কেরাণী বলেন, দুর্নীতিই তাঁর আত্মরক্ষার অবলম্বন।"

লাবণ্য ওর বেদনা-বিশীর্ণ ঠোঁটে একটু শুকনো হেসে বললো, "শেষ পর্যন্ত ওই নীচের সমাজের মানুষরা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ক্রমে হারিয়ে যাবে, ওদের শ্মশান আর কবরের উপর সভ্যতার নতুন সিঁড়ি গড়ে উঠবে। তাই দেখি ওদের য়্যাবসেন্ট করা হয় কিন্তু হাজিরা খাতায় নাম লেখা থাকে, ওদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে সর্ব্বদা ওদের বঞ্চিতই করা হয়।"

স্মিত মুখে সবিতৃ বললেন, তবে আর খুব বেশী দিন নয়, চাকা ঘুরেই, দিন বদলাচ্ছে। দুঃখের দিন অবসান হয়ে এল, অন্ধকার কেটে যাবে, আকাশে এবার নতুন সূর্য উদিত হবে, নতুন আলোর স্পর্শে তরু শাখা মৃত্তিকা সজীব হয়ে উঠবে,

নতুন পৃথিবীর জন্ম হবে। সেই দিনটির জন্যেই আমরা অপেক্ষা করে আছি।

লাবণ্যর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললো, "দাদা নীচের তলার মানুষরা ওঁকে খুব ভালোবাসে।"

সবিতৃ বললেন, "ওদিকে মজুমদার তো ভীষণ বিব্রত, দাপাদাপি করছে, কেরাণী মাথাব চুল ছিঁড়ছে আর ঠোঁট কামড়াচ্ছে—বিদ্যুতের সর্বনাশ কি করে করা যায় সেই রাস্তার সন্ধান করছেন।"

অবজ্ঞায় বিকৃত ঠোঁটে লাবণ্য বললো, "পনেরো টাকার গেটম্যানের কী আর সর্বনাশ করবে? চাকরীটা গ্রাস করবে? করুক। নিতান্ত দায়ে পড়ে আমাকে বিয়ে করে চাকরী নিয়েছিলেন। এরপর যুদ্ধ, মন্বন্তর, পঙ্গু মেয়েন জন্ম চাকরী জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে তুললো। চল্লিশ টাকা চালের মণ যখন আমরা আট টাকায় খেয়েছি। এবার আমাদের সরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে, কোহিনুরদের আশ্রমে চলে যাব, চাষবাস করে আর সুতো কেটে, কাপড় বুনে রুটির জোগাড় করে নেব।

খুশি হয়ে সবিতৃ বললেন, "এমনই করেই দুর্জয় সাহস বুকে নিয়ে অপমানিত দাসত্বকে লাথি মেরে ভেঙে ফেলতে হবে। মেয়েদের সব সংস্কারকে গুঁড়ো করে ফেলে, বাধা-নিষেধের গণ্ডি পার হয়ে পুরুষের পাশে সহকর্মিণী হয়ে দাঁড়াতে হবে।"

উজ্জ্বল মুখে লাবণ্য বললো, "কোহিনুরকে দেখলুম দাদা, ঠিক যেন আপনার আদর্শের প্রতিমূর্তি। দিব্যি তিন চার মাইল রাস্তা, সাইকেল চড়ে এল। কুলিদের সম্বন্ধে ওঁর সঙ্গে যেন কী দরকার ছিল। সকালে কুয়ো থেকে জল তোলা হয়নি, মেয়েটা তেষ্টায় ঘ্যানোর ঘ্যানোর করছে, সে তো দেখেই রেগে অস্থির। বললো, "তোমরা কী মানুষ হবে না বউদি? কখন বিদ্যুৎদা আসবে, জল

আনবে, তবে তোমার মেয়ে খাবে। তবু তুমি বোরখার গণ্ডিকে ভেঙে ফেলে বাইরে বেরিয়ে জল আনতে পারবে না? তোমার ও তথাকথিত সম্ভ্রমের মর্য্যাদাবোধ ঘুচিয়ে ফেল এখনই।"

সবিতৃ বললেন, "গ্রামে গ্রামে কোহিনুরের মত মেয়ে দরকার, যারা ঘুমন্ত নারী-সমাজকে জাগাতে পারবে।—না জাগিলে ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না।"

এবার সবিতৃ উঠবার উপক্রম করলেন; বললেন, "গোয়ালঘরের কাজে পাট লাগিয়ে গেলুম, দেখে নিস, মজুরী আমার কাছে নেবে।"

লাবণ্য ততক্ষণে ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছে। একটা রেকাবে কয়েকটা নারকেলের নাড়ু এনে বললো, "পুলিন খালাসীকে জানো তো, খুলনায় বাড়ী, অনেক নারকোল এনে দিয়েছে।" একটু ইতস্ততঃ করে বললো, "দাদা গুড়ের চা।"

"আমি খেয়েছি রে।" পরিতৃপ্তি সহকারে নাড়ু চিবুতে চিবুতে বললেন সবিতৃ, "ওঃ কতদিন বাড়ী যাইনি, এগুলোর স্বাদ প্রায় ভুলেই গেছলুম, সংসারে যাদের মা নেই, সত্যি তারা বড় অভাগা, সংসারে তার কোনও আকর্ষণই থাকে না।" লাবণ্য কতকটা নিজের মনেই বললো, "কতবার, কত কী তৈরী করতুম, ভাবতুম, তুমি আসবে।"

খুকী কথাবার্তা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ওকে পরীক্ষা করতে করতে ডাক্তার সবিতৃ বললেন, "পাঠিয়ে দিতিস না কেনরে?"

এই সময় বিদ্যুৎ বাইরে থেকে ফিরলো, উস্কোখুস্কো চুলগুলি, মন যেন অত্যন্ত অবসন্ন, দেহ পরিশ্রান্ত। সবিতৃকে দেখে ভারাক্রান্ত মনটাকে লঘু করতে বলে ফেললো,— "Hopeless দাদা," এবার ও লাবণ্যর দিকে তাকালো, "জামাগুলো তৈরী করলে লাবু? আজই হাটে বেচে আসতে হবে, মন্টুদার বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, মুকুটদের তাঁতে যদি কিছু কাপড় পাওয়া যায়।"

"Hopeless কেন ভাই?" সবিতৃ জিজ্ঞেস করলেন, "অত নিরাশ কেন হয়ে পড়লে?"

রুক্ষ অবিন্যস্ত চুলগুলির মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বিদ্যুৎ বললো, "ওদের জন্যে কিছুই করতে পারলুম না দাদা। অনেক চেষ্টায় ওভারডিউটি খাটলে একটা য়্যালাউন্স ব্যবস্থা করেছিলুম, সব বরখাস্ত করে দিল। অথচ মহেশ আজ তিনদিন উপবাস করে রয়েছে, যে ক'টা টাকা ছিল হাতে, মেয়ে শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছিল, লৌকিকতা করতেই ফুরিয়ে গেল।"

অবসন্ন কণ্ঠে সবিতৃ উত্তর দিলেন, "ওদের হাতে যখন চাবি-কাঠি, আমাদের মেনে না নিয়ে উপায় নেই।"

সবিতৃর সাইকেল আর দেখা যায় না, তাঁর কথাগুলি একটা বিচিত্র অনুভূতির সঙ্গে সে অনুভব করছিল, "চাবি-কাঠি ওদের হাতে।"

বিদ্যুৎ গেটম্যানেরও হাতের কল ওই চাবি-কাঠি কী হতে পারে না? যার পাখার আর বাতির ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের পথ চলা নির্ভর করছে।

জীবনটা রেলগাড়ী ছাড়া আর কী? কত দুর্জয় আর দুর্গম পথ চলা, কোথায় যাত্রার শেষ কেউ জানেনা। জীবন-রেলগাড়ীর চাবি কার হাতের কল-কাঠি? দুর্বার প্রশ্ন জাগে বিদ্যুতের মনে।

বারো

আরও কয়েকমাস পরে। কার্তিকের মাঝামাঝি। কাঁচা ধানে সোনালী রং ধরেছে, যেন চাষীর শ্রমের রং আর প্রাণের রং-এর মাতন লেগেছে ধানের শীর্ষে আর ফসলের সবুজ মাঠে মাঠে। তিস্তার অববাহিকা আবার বিশীর্ণা। শুধু বালুচর আর কাশের সমারোহ। ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা বক ডানা মেলে উড়ে আসে।

রাষ্ট্রনৈতিক আকাশেও নূতন এক অধ্যায়ের ইতিহাস আত্ম-প্রকাশ করলো। যেন প্রাণবন্যার মাতন জেগেছে। বরেণ্য নেতা সুভাষচন্দ্রের অপূর্ব বীরত্বের কাহিনী, বিচিত্র শৌর্য বীর্যের পরিচয়। নূতন প্রাণস্পন্দনে মানুষ কান পেতে শুনলো। সংগঠনী-শক্তি আর প্রেমের অভূতপূর্ব্ব পরিচয় মানুষ আত্মবিভোর হয়ে জানলো।

পৃথিবীর ইতিহাসে বিস্ময়কর ঘটনা, নূতন সেনাদল গঠন। আজাদ হিন্দ্ বাহিনী বুঝি সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিল; ভারতের মুক্তির-সাধক ক্যাপ্টেন শা-নওয়াজ, ধীলন, সাইগল, নারীর বীরত্বের গৌরব কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামীনাথন, বেলা দত্ত শিপ্রা সেন, যুগান্তরকারী অভিযানে এঁরা রাঙা সূর্যের অভ্যুদয়েরই সূচনা করলো। সুপ্ত চেতনার কলঙ্ক কালিমা খানখান হয়ে ভাঙলো, জাতির ললাটে বিজয়-টীকার নব জাগরণ আনলো।

সারা এশিয়ায় নব জাগরণের জোয়ার এল, একদিকে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার দুর্বার অভিযান আর একদিকে দমননীতি আর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার বিকৃত উন্মত্ততা। ইন্দোচীন আর ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে ওলন্দাজ ও ফরাসী জাতির নির্মম প্রভুত্ব, ব্রিটিশ শক্তির বর্বরোচিত

জুলুম ও অত্যাচার। চীনের গৃহ বিবাদের সুযোগ নিয়ে কূটনৈতিক মার্কিনের সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির লোলুপতা, প্যালেষ্টাইনে আরবদের দাবী অগ্রাহ্য, লেবাননে ফরাসীদের পুর্ণোদ্যম চক্রান্তের বিভীষিকা।

সবিতৃ এইমাত্র বাইরে থেকে ফিরলেন। সামনে খবরের কাগজখানা খোলা রয়েছে। সুভাষচন্দ্রের গলার মালা বারো লক্ষ টাকার নিলামে উঠেছিল। এই বিস্ময়কর জনপ্রিয়তার তুলনা বুঝি পৃথিবীর ইতিহাসে আজও মেলে না। সবিতৃ ভাবলেন, সেদিন কলিকাতা মহানগরীতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়েছিল, তখন তিনি মেডিক্যাল লাইনের ছাত্র, আজকের এই মহীরুহের সম্ভাবনা তিনি সেদিনকার মুকুলের অস্ফুট বিকাশেই দেখতে পেয়েছিলেন, অরণ্যের আশ্বাস জেগেছিল কিশলয়ের মধু মঞ্জুষায়। আজকের এই বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠনের প্রতিচ্ছবি সেদিনের স্বেচ্ছাসেবক গঠনের নেতৃত্বের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কুঁড়ির ভিতরে গন্ধের মত কী যেন পাওয়ার ব্যাকুলতা গুমরে মরছিল সেদিন। এরই নাম বুঝি সংগঠনের দুর্বার আকর্ষণ। সবিতৃ অন্যমনস্ক হয়ে গেছলেন। বিলাতের নূতন মন্ত্রীসভা গণতন্ত্রের মুখোস খুলে ফেলেছে। য়্যামেরিকায় বিজয়লক্ষী পণ্ডিতের দৃঢ় মন্তব্য প্রকাশ। সবিতৃ এবার মিডয়ফেরী মোটা বইখানা র‍্যাক থেকে নামালেন। ইতিমধ্যে বার দুয়েক মৈনাকের কোয়ার্টারে গোপাকে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন, প্রসবের দিন ওর আসন্ন, দিন পনেরো আগে নার্স আসবে, ওর সেবা-শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করবে। সবিতৃ বলেছিলেন, এ সময় তার মানসিক প্রশান্তির প্রয়োজন।

মানসিক প্রশান্তি, গোপা একটু না হেসে পারলো না, এমন মাঠের মধ্যে ওদের বাস করতে হয়। দুই ধারে শুধু চাষাভুষো মানুষ, কথা বলবার একটুও উপায় নেই। একদিন মৈনাকের সঙ্গে ট্রলিতে

ষ্টেশন ছাড়িয়ে চলতে চলতে বলেছিল "দাদা, চলোনা কোহিনুরের হোটেলে গিয়ে চা খেয়ে আসি, ওদের সঙ্গে আলাপ করতে দোষ কী ?"

মৈনাক রাজী হতে পারেনি। পারেনা সে সম্মত হতে, প্রতি মুহূর্তে যে-নারীর কাছে সে পরাজিত, তার প্রতি ওর এতটুকু সম্প্রীতি থাকতে পারে না। কঠোর নীতি অবলম্বন করে শ্রমিকদের সে আয়ত্তে এনেছিল, কোহিনুরের লিখিত দরখাস্তে যুক্তি ও তর্কের কাছে তাকে পরাজিত হতে হয়েছে। আর একদিন ট্রলিতে সে লাইন থেকে ফিরছিল, লাইনের এক ধারে একটি পুকুরের পাড়ে কোহিনুর জলে ছিপ ডুবিয়ে বসেছিল। ট্রলি-ঠেলা কুলিগুলো অত্যন্ত প্রভুভক্ত। শ্রমিকদের মধ্যে ওরা বিভীষণের মত কাজ করে যায়। সাহেবের বাড়ী খেতে পায়, মাইনের টাকা ব্যয় হয় না, তাই কৃতজ্ঞে আর কৃতার্থে প্রভুর গোলাম বনে গিয়েছে।

ট্রলিম্যান বললো, "হুজুর, ওই দিদি খালাসীদের দরখাস্ত লিখে দেয়।" আগুনের উত্তপ্ত দৃষ্টিতে ওই দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মৈনাক বললো, "ওখানে মহেশ, পুলিন, বিশ্বনাথ রয়েছে না ?"

"হ্যাঁ হুজুর।"

মৈনাক আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলো না, উত্তেজনায় দিশেহারা মন তার থরো থরো কাঁপতে লাগলো, প্রভুত্বের দৃঢ় ভঙ্গিমায় দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে কুলিদের জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা কাজে যাওনি ?"

"না"

"মানে"

ওরা নিরুত্তর। কোহিনুর এবার উত্তর দিল। "মানে আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আপনি ওদের সাসপেণ্ড করে রেখেছিলেন, ওরা মাইনে পায়নি, কাজে যাবে না, চাকরী করবে না।"

"ওঃ, তাই বুঝি আপনি ওদের রেজিগ্‌নেশন-লেটার লিখে দেবেন," শ্লেষের ক্ষুরধারে মৈনাকের চোখের মণি চকচক করে উঠলো।

এ কথার কোনও উত্তর দিলনা কোহিনুর; কঠিন অথচ শান্ত গলায় বললো, "প্রতি মুহূর্তে আপনি ওদের পায়ের তলায় রেখে ও শাসন যন্ত্রে পিসে মেরেও আক্রোশ আপনার মেটেনি। অত্যাচারে আর অবিচারে ওদের জয় আপনি করেছেন, কিন্তু নৈতিক জয় আপনার হয়নি। মানুষের প্রতি একটু দয়া নেই, প্রেম নেই, স্নেহ নেই, ভালোবাসা নেই। সাম্রাজ্যবাদী শাসননীতি নিয়ে ওদের পরিচালনা করেন, বিচার করেন, পীড়ন করেন।"

মৈনাক কী উত্তর দেবে? স্পষ্ট কঠোর বক্তব্য। শুধু বললো, "মিস লাহিড়ী, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের শ্লোগান করা যায়, এর বেশী কিছু নয়।"

কোহিনুর এবার একটু না হেসে পারলো না, "গণতন্ত্রের শ্লোগান নয় মৈনাকবাবু, আপনাদের ওই ডিক্টেটরসিপ নির্মূল করার পরেই গণতন্ত্রবাদের নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা হবে।"

"বৃটিশ সাম্রাজ্য-ডিক্টেটরসিপ তাড়ানো,—" উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো মৈনাক। ওর হাসি থামলে কোহিনুর বললো, "বৃটিশ সাম্রাজ্য নাও থাকতে পারে মৈনাকবাবু।"

"স্বাধীনতাকে সেদিন আমরাও স্বাগত জানাতে দ্বিধা বোধ করবো না মিস লাহিড়ি।" ঠোঁটের বাঁকা ভঙ্গিতে মৈনাক বললো, "এখন যে-রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে রয়েছি, তাদের নীতি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করাই আমার আদর্শ।" এরপর মৈনাক আর সেখানে দাঁড়ায়নি। ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে কোহিনুর ভাবলো, মৈনাক যে দাসত্বের রঙ্গমঞ্চে একজন নিপুণ অভিনেতা তা অস্বীকার করা যায় না।

তেরো

একটু স্নেহ নেই, প্রেম নেই, একবিন্দু মমতা নেই, ভালোবাসা নেই। কোহিনুরের কঠোর মন্তব্যটা চাবুকের তীব্র কশাঘাতে যেন মৈনাকের স্নায়ুমণ্ডলীকে অত্যন্ত পীড়িত করে তুললো।

সত্যি কথা বলতে কি মৈনাকের জীবন-দর্শনে কোনও আদর্শ-কোনও লক্ষ্য বলতে কিছুই ছিল না। কোনও সত্ত্বা ছিল না জীবন-বোধে, কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না চরিত্রে। ছিল একটু রুচি-পারিপাট্য, নিখুঁত সৌন্দর্য্যবোধ। সুকুমার লাবণ্য চেহারাটিকে কেতাদুরস্ত প্রসাধনে আরও মনোরম করে তুলতো। প্রত্যহ কোটের বাটনহোলে একটি সুগন্ধী গোলাপ লাগানো চাই। মেয়েরা সহজে ওর দিকে আকৃষ্ট হোত, কিন্তু এখনও ও তার মানস প্রতিমাটির সন্ধান পায়নি।

চাকরী ও করে ঠিক অভাববোধে নয়, সরকারের দাসত্বের প্রতি ওর একটা অহেতুক মোহ রয়েছে, এ মোহ ওর একার নয়, ওদের বংশ-পরম্পরা ইংরাজের প্রতি একটা অনুরাগ চলে আসছে।

ইংরেজ ভাবাপন্ন সংসারে ও জন্মেছে, লালিত হয়েছে, ইংরেজের রীতিনীতি হুবহু অনুকরণ করেছে। ইংরাজের বৈষম্যমূলক নীতিকে কোনদিন বিচার করে দেখেনি। ওরা এক চোখের বিদ্বেষ দৃষ্টিতে ভারতবাসীকে দেখে, আর এক চোখে নিজের জাতিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।

মৈনাকের সমগ্র পরিবার ইংরাজের ওই বিদ্বেষ-দৃষ্টিকে অনুকরণ করেছিল। তাই ওদের রক্তে সাম্রাজ্যবাদী বিবেকবোধের উৎসই

প্রবাহিত। মানুষকে শ্রদ্ধা করে না, ভালোবাসে না, ক্ষমা নেই, প্রীতি নেই, মানুষের প্রতি একটু দরদ নেই।

ইংরাজের মন নিয়ে দেশের মাটিকে গ্রহণ করেছিল, সাধারণ দরিদ্র মানুষকে তাই ঘৃণা করারই শিক্ষা পেয়ে এসেছিল।

বর্শার আঘাতে ও যেন গভীর সুপ্তির দেশ থেকে জেগে উঠলো। ওর শ্রুতিমূলে যেন অনুরণিত হয়ে ফেরে,—একটু স্নেহ নেই, মমতা নেই, একবিন্দু ভালোবাসা নেই।

স্নায়ুতে মর্ম্মরিত হয়ে ওঠে এক অব্যক্ত ব্যাকুল প্রশ্ন, মানুষের প্রতি সত্যিই কী ওর হৃদয়গত কোনও আকর্ষণই গড়ে ওঠেনি? নিছক দাসত্বের মন্ত্রেই কী ও বাঁধা?

দিন কয়েক পর ও সেদিন বিকেল বেলা অফিস-রুমে বসেছিল। খানকতক চিঠিপত্রে এখনও স্বাক্ষর বাকি, চৈতন্যের দরখাস্তখানা ওকে রীতিমত চঞ্চল করেছিল। চৈতন্য লাইন-শ্রমিক, ও হেড অফিসে দরখাস্ত দিয়েছে। তিনমাসের ছুটি চায়। মৈনাককে সই করতে হবে।

কিন্তু মৈনাক কী করবে? চৈতন্য সম্প্রতি টিউবারক্লোসিসে আক্রান্ত হয়েছে। প্রথম সূচনা। সবিতৃ বলেছে, বিশ্রাম পেলেই আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা, এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার প্রয়োজন। টি-বি হস্‌পিট্যালে ফ্রী বেডের জন্যে চেষ্টা করতে পারেন।

মিনতি জানিয়ে চৈতন্য বলেছিল, "বাবু এখন জানাজানির প্রয়োজন নেই, হেড অফিস জানতে পারলে চাকরিটা খতম হয়ে যাবে। বৌ ছেলে না খেয়ে মারা যাবে।"

দরখাস্তে সে জানিয়েছে ঘর-গেরস্থালীর কাজে ওর ছুটির প্রয়োজন। দরখাস্তখানা হাতে নিয়ে মৈনাক অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিল। একদিকে আশঙ্কা—যদি সত্য ঘটনাটি প্রকাশ হয়ে যায়, আর একদিকে অশ্রান্ত

মনের একটা উদ্বেলতা; রেলওয়ে Administration-এর সঙ্গে প্রতারণা করছে। চিন্তার বিপর্যয়ে মৈনাকের সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে এল। চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে করতে সে ভাবলো, বর্ত্তমান অবস্থায় স্নেহ, প্রেম ভালোবাসার স্থান কোথায় কোহিনুর দেবী কী বলে দেবেন? সমস্যা কত যে জটিল তা ভুক্তোভুগী ছাড়া কারও বুঝবার যো নেই। কিছুক্ষণ আগে একটি কুলি এসে জানালো, "হুজুর মাস তিনেক আগে কেরাণীবাবুকে র‍্যাশান কার্ড দিয়েছিলুম...।"

"দিয়েছিলুম নয়," গম্ভীর কণ্ঠে মৈনাক বললো, "বন্ধক রেখেছিলুম।" মুখ নীচু করে ফেললো দেবেন। অপরাধ স্বীকার করে বললো, "হুজুর দশটা টাকা বাড়ীতে না পাঠালে ছেলেটা মরে যেতো। এতদিন কার্ডের দরকার ছিল না, কেরাণীবাবু দুমুঠো খেতে দেয়, দিন চলে যায়।"

"হঠাৎ দিন কেন চললো না?" মৈনাক জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকালো।

একটু ইতস্ততঃ করে দেবেন বললো, "হুজুর খাওয়ার ব্যাপারটা হোল এই পেটের মধ্যে, কী ঘটছে কেউ তা দেখতে পায় না। এবার পরণের ব্যাপার, র‍্যাশান কার্ড দরকার।

"টাকার জোগাড় করেছিস।"

"আমার কার্ডে চারখানা কাপড় আছে সাহেব। বাজারের মহাজন ত্রিশটাকা দিয়েছে, তিনখানা কাপড় নেবে, আমি একখানা পাব। ত্রিশটাকার মধ্যে টাকা পনের খরচ করে কার্ডখানা ছাড়াতে পারব, বাকী টাকায় কাপড়গুলো নেব।"

"তুই একা মানুষ, চারজনের কার্ড?"

"হুজুর, কেরাণীবাবু লিখে দিয়েছে।"

"তুই তাকে দক্ষিণা দিয়েছিস?"

আকাশ বিচরণকারী মানুষ এবার মাটির স্পর্শ পেয়েছে বুঝি।

"হুজুর পাঁচটাকা জলপানি দিয়েছি, দুইজনের জিনিষ বাবুকে ধরে দি। কা বন্ধক রেখে সে পথও আমার বন্ধ হয়েছে।"

"সব কথা আমাকে বলিস নি কেন?"

"হুজুর, আপনি না শুনলে আপনাকে কি করে বলি।" দেবেন বললো, "বিদ্যুৎবাবু আমাদের খুব ভালোবাসেন, কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর কোনই ক্ষমতা নেই, তিনি বলেন, আপনাকে জানাতে। কয়দিন থেকে শুনছি আপনি আমাদের সব কথা শুনছেন। তাই অনেক আশা নিয়ে ছুটে এসেছি। কেরাণীবাবু আমার কাপড়গুলো মোটা টাকায় বেচবে, তাই আমার কার্ড ফেরৎ দিতে চায় না।"

দেবেন এইমাত্র প্রস্থান করেছে। তাকেও আশ্বাস দিয়েছে ব্যবস্থা করবে। চৈতন্যর দরখাস্তখানা হাতে তুলে নিল। সই করবে।

"স্যর"...এইসময় কেরাণী হরিসাধন ঘরে ঢুকলো। যেন অত্যন্ত শান্ত নিরীহ মানুষটি? নম্রতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে নিরন্তর কেঁচোর মত কুঁকড়ে রয়েছে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মৈনাক। মৈনাকের রুক্ষ দৃষ্টির সামনে হরিসাধন অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলেও এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেও একান্ত অন্তরঙ্গের মতই বললো, "প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে চৈতন্যের একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করেছি। ওর দরখাস্তখানা বদলে লিখে নিতে হবে ওর যে মারাত্মক ব্যাধি হয়েছে।"

"ওঃ" শ্লেষের কণ্ঠে মৈনাকের মন্তব্য প্রকশে অত্যন্ত বিকৃত শোনাল। ওর পদ পূরণের লোক বুঝি আপনার প্রস্তুত। তাই তার চাকরীটা খতম করতে আপনি এত ব্যগ্র?" হরিসাধন কয়েক-দিন থেকে মৈনাকের চরিত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল, তবে এত দ্রুত যে এই নির্মম সত্যের মুখোমুখী তাকে হতে হবে জানা ছিল না।

অপ্রতিভ ভাবটা মুহূর্তে সংযত করে নিয়ে বললো, "স্যর, অফিসে জানাজানি হয়ে গেলে তখন একটা…"

"জানাজানি করবে কে? আপনি তো হেড অফিসে কেরাণীকে গিয়ে জানিয়ে আসবেন?"

কী বলবে কেরাণী হরিসাধন! নির্বাক, নিরুত্তর। সত্যই সে যে আশা করেছিল, চৈতন্যকে সরিয়ে দিয়ে ওর ভাগ্নেকে ওই পদে বাহাল করবে, কিন্তু হঠাৎ সাহেবের মনের এ পরিবর্তন কেন ঘটলো, সে বুঝে উঠতে পারে না। এতদিন সত্যের উপাসক বলে জেনে এসেছে ওরা ওদের সাহেবকে। কোনও মিথ্যাকে, অন্যায়কে তিনি কোনও দিন প্রশ্রয় দেন নি।

কেঁচোর মত আরও কুঁকড়ে সে বললো, "হুজুর আপনি যা বলবেন, তাই হবে।"

"যা সই করবার আমার হয়ে গিয়েছে, আপনি নিয়ে যেতে পাবেন।"

কেরাণী চিঠি পত্র নিয়ে ফিরেছে। চাপরাশী এবার অফিস বন্ধ করবে, কিন্তু বাড়ী ফেরবার উৎসাহ কই মৈনাকের।

অফিস থেকে বেরিয়ে মৈনাক বাঙলোয় আর ফিরলো না। তিস্তার ধার দিয়ে ও হেঁটে যেতে লাগলো। বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ঘেঁটুবন আর কলাবন পার হয়ে ও হাঁটতে লাগলো। কোথায় যাবে ও জানে না, শুধু যেতে ভালো লাগে। কার যেন আহ্বান, কিসের যেন আকর্ষণ ওকে টানছে। তাই বুঝি সীমাহীন ওর যাত্রা, অন্তহীন ওর গতি।

দেখতে দেখতে একটা গ্রামের মধ্যে ও এসে পড়লো। পথের আশেপাশে আগাছা আর জঙ্গল ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। তারই মধ্যে জনতার ভীড় দেখে ও বিস্মিত না হয়ে পারলো না।

এই ক্ষুদ্র গ্রামে এত মানুষ কোথেকে এল? মেয়েদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। দলে দলে গ্রাম্য-বধূরা এগিয়ে আসছে। চাষার ঘরের মেয়ে ওরা। বৃদ্ধা থেকে উলঙ্গ শিশু একের পর এক সারি বেঁধে এগিয়ে আসছে। মনে হয় যেন কোনও সভা থেকে ওরা বক্তৃতা শুনে ফিরছে। হাতে রয়েছে ছোট ছোট পুস্তিকা। পুস্তিকার মর্মার্থ গ্রহণ করতে না পারুক কী যেন আশার উদ্দীপনায়, উৎসাহের আনন্দে ওদের চোখ মুখ উজ্জ্বল।

বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে মৈনাকের কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল। থমকে দাঁড়িয়েছিল সে কিছুক্ষণ।

মাঠের মধ্যে দিয়ে ও আবার হাঁটতে সুরু করলো। সামনের দিকে দ্রুত পায়ে কোহিনুর এগিয়ে আসছে, হাতে একগোছা কাগজপত্র রয়েছে। মৈনাক সহজেই বুঝতে পারলো কোহিনুর কোথায় গিয়েছিল।

ওরা দুজনে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল. কোহিনুর একটু হেসে ফেললো। দুজনেই হাত তুলে দুজনকে নমস্কার জানালো।

কোহিনুর বললো, "বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি। সন্ধ্যে নেমে এ'ল আর কতদূর যাবেন? চলুন এবার ফেরা যাক।"

ওর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে মৈনাক বললে, "এই গ্রামে বুঝি মেয়েদের সভা ডেকেছিলেন।"

কোহিনুর বললো, হ্যাঁ, ওদের একটু আলোর সামনে যদি নিয়ে আসা যায়—এই আর কি।

গোধূলি বেলার ফিকে রক্তিম আলোয় মৈনাক ওর আশা-উজ্জ্বল মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কয়েকটি পুস্তিকা ওর হাতে দিয়ে কোহিনুর বললো, "দেখুন।"

মৈনাক পুস্তিকাটির পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগলো। পৃষ্ঠায়

পৃষ্ঠায় নারীর বীরত্বের অপূর্ব পরিচয়। ইতিমধ্যে ওরা আর একটা গ্রামের প্রান্তে পৌঁছেচে। কোহিনুর বললো, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এদের খবর দিয়ে আসি কাল এই গ্রামে সভা হবে।"

কিছুক্ষণের মধ্যে কোহিনুর ফিরে এল। কোহিনুর বললো, "উঃ, এ গ্রামের যা অবস্থা—মোড়লের বউয়েই আবার সন্তান হয়েছে। এই নিয়ে গোটা বাইশ হোল। ফ্যাকাশে রং, গায়ে এক ফোঁটা রক্ত নেই—তবু এদের সন্তান হয়ে যায়।"

মৈনাক বললো, "দুশো বছরের অজ্ঞাত আর ক্লেদকে কী আপনি একদিনে তাড়াতে পারবেন।"

কোহিনুর বললো, "Give me blood I will give you liberty". পরমুহূর্তে কোহিনুর আবার কৌতুক মিশ্রিত কণ্ঠে বললো, "না, আপনার কাছে আর কিছু বলবোনা, আপনি সরকার বাহাদুরের বিশ্বস্ত কর্মচারী।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেসে উঠলো মৈনাক। "না না, আমি আপনার সহকর্মী।"

"সত্যি বলছেন মৈনাকবাবু, আপনি আমার সহকর্মী?" পরম নির্ভরতার আশ্বাস বুকে নিয়ে মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে কোহিনুর মৈনাকের সুকুমার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"বিশ্বাস করুন আমাকে," মৈনাকের দৃষ্টিতে হৃদয় আবেগ উৎসারিত হয়ে উঠলো। "বিশ্বাস করি আমি আপনাকে মৈনাকবাবু।"

কৃতজ্ঞতায় কোহিনুরের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে আসে যেন।" বিদ্যুৎদার কাছে শুনেছি আপনি কর্মচারীদের অভাব অভিযোগ শোনেন, সাধ্যমত প্রতিবিধান করেন।"

"আমি ওদের কথা শুনি কোহিনুর দেবী, তবে প্রতিবিধানের ক্ষমতা

আমার হাতে নেই।" মৈনাক একটু বিষন্ন হেসে বললো, I am only servant of the Administration."

ওকে উৎসাহিত করে কোহিনুর বললো, আপনি কাগজে-কলমে Administration-এর discipline রক্ষা করুন। মনে মনে ওদের প্রতি স্নেহশীল আর ক্ষমাশীল হয়ে উঠুন। দেশের মানুষকে যদি দেশের মানুষ ভালো না বাসবে, কে দেখবে বলুন?"

এবার ওরা এসে থামলো একটি বড় মাঠের প্রান্তে, একদিকে স্টেশন, আর একদিকে মৈনাকের বাঙ্লো।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মুখোমুখি। এবার দুজনকে দুদিকে ফিরতে হবে। তবু দাঁড়িয়ে থাকতেই দুজনের ভালো লাগছিল। গোধূলির মায়া ওদের চোখে বুঝি স্বপ্নকাজল পরিয়ে দিয়েছিল।

চমক ভাঙলো কোহিনুরের। বললো, "একদিন আসবেন আমার হোটেলে, একটু চা খাবেন।" পরমুহূর্তে কৃত্রিম কটাক্ষ হানলো কোহিনুর মৈনাকের দিকে, "অবশ্য আপনার যদি প্রেষ্টিজে বাধে..."

"আপনি আমার প্রেষ্টিজ আর রাখলেন কই!" মৃদু মৃদু হাসছিল মৈনাক। "আমার সব স্টাফরা কী বলেন জানেন, আপনার দয়াতেই আমি নাকি গরীবের মা-বাপ হয়েছি। ওরা দুজনে হেসে উঠলো একসঙ্গে প্রগলভ কণ্ঠে। দুজনে হাঁটতে লাগলো দুদিকে। কোহিনুরের মনে হল ওরা পরস্পরের যেন বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে ক্রমশ।

চৌদ্দ

আরও কিছুটা সময় কাটলো। চারটে বাজলো, ডিসপেন্সারীতে ডাক্তার সবিতৃকে আরও এক ঘণ্টা কড়ি-বরগা গুনতে হবে। জেলা অফিসার বলেছে Administration-এর discipline যেন ক্ষুন্ন না হয়।

আসবাবপত্রে সুসজ্জিত ডিসপেন্সারী ঘর, রং-বেরঙের শিশি বোতল, আরও আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র। টেবিলের উপরিস্থিত ব্রাউন মলাটের 'সিক্ সার্টিফিকেট' বইখানা রেলওয়ে রোগীদের সত্যিকার প্রাণ। ওষুধ ছাড়া স্বাস্থ্য অচল কিন্তু সার্টিফিকেট ছাড়া জীবন অচল। চাকুরেরা মন্তব্য প্রকাশ করে বলে, "রেলওয়ে ডাক্তারখানার কাঠামো সার্টিফিকেট। ওষুধপত্র তার উপরের রং, সে রং এতই ফিকে কারও কোনও মনোযোগ আকর্ষণ করেনা। এইমাত্র কয়েকজন কর্ম্মচারী অয়েন-সার্টিফিকেট নিয়ে ফিরে গেল। একজন 'দাঁত তুলেছে', আর একজন 'কানের যন্ত্রণায় ছটফট করেছে'।

এরপর আর যে রেলকর্মী আসবে না সবিতৃ জানেন। স্থানীয় কর্মচারী কয়জনই বা? লাইনের এখন আর কোনও ট্রেন নেই। তবু সবিতৃর আরও ত্রিশ মিনিট কড়ি-বরগা না গুণে উপায় নেই। ডিসিপ্লিন্। সামনে সেদিনের খবরের কাগজ খোলা ছিল। পুরানো খবর কিছু প্রকাশিত হয়েছে। বিপ্লবী বীর সুভাষচন্দ্র। দেশের মাটি কাঁপিয়ে তুমুল ঝড় উঠেছে, আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্তদের মুক্তি চাই। বহুদিন পর আবার পণ্ডিত নেহেরু কৌসুলীর পোষাক গায়ে চাপিয়েছেন।

"ডাক্তার কাকা।"

"কে মুকুট? এস।"

টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মুকুট বললো, "মা আপনাকে একবার যেতে বলেছেন।"

"কার অসুখ করলো মুকুট।"

"আশ্রমের দুটি মেয়ের, জর কিছুতেই ছাড়েনা। কুইনিন য়্যাম্পল সঙ্গে নিয়ে কাল সকালে একবার যাবেন। মুকুট আর দাঁড়ায়নি। মাঠের মধ্যে দিয়ে ওর সাইকেল ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল। সবিতৃরও সময় হয়ে গেছে, উঠে দাঁড়ালেন।

"ডাক্তার বাবু।"

ব্যাগ হাতে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন সবিতৃ। সামনে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন রোগী শ্যামসুদ্দিন। সাইকেলের কেরিয়রের সঙ্গে ব্যাগ বাঁধতে বাঁধতে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে শ্যামসুদ্দিন, তোর আবার কী হোল?"

শ্যামসুদ্দিন নিরুত্তর। বিষণ্ণ দৃষ্টিটা ওর কী যেন ব্যাকুল আবেদনে কেঁপে কেঁপে ওঠে। কী যেন চাওয়া ঝকঝক করে ওর চোখের মণিতে। ওর এ আবেদন সবিতৃর অজানা নয়। পকেট থেকে কয়েকটি য়্যাস্পিরিন পাউডার বের করে দিয়ে বললেন, "আর এগুলো খাসনে, ঘরে যাবি।"

"আর এগুলো খাসনে," ডাক্তারের নিজের কানেই নিজের এই নিষেধাজ্ঞা কেমন যেন ব্যঙ্গোক্তির মত শোনাল। গত মন্বন্তরের মর্মন্তুদ ইতিহাসের সে এক বিচিত্র ঘটনা। বারো বছরের ছেলের ক্ষিদের তাগিদে অস্থির হয়ে শ্যামসুদ্দিন বলেছিল, "ভাত কোথায় পাব, মরগে যা তুই।"

পরদিন সকালবেলা শ্যামসুদ্দিন পুকুরের জলে ছেলের মৃতদেহ

ভেসে উঠতে দেখেছিলো। এরপর থেকে শ্যামসুদ্দিনের মাথায় অসহ্য এক যন্ত্রণা। য্যাস্‌পিরিন পাউডারেই সে যন্ত্রণার উপশম হয়। শুধু বেদনাই উপশম হয় না, তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টি একটি বিভোর আমেজে মুদ্রিত হয়ে আসে। তারই সঙ্গে সঙ্গে ওর সামনে মৃত পুত্রের ছবিটা ফুটে ওঠে।

এরপর থেকে য্যাস্‌পিরিনের নেশা জাগে শ্যামসুদ্দিনের। হতভাগ্য পিতা মৃত পুত্রকে স্মরণ করবার লোভনীয় পথ আবিষ্কার করেছে।

সাইকেলে প্যাড্‌ল করতে করতে সবিতৃ ভাবলেন, ঔষধের শরণাপন্ন হয়ে মানুষকে মৃত পুত্রকে স্মরণ করতে হয়। তবু সেদিন আড়তদারের গুদামজাত চাল ছিনিয়ে আনবার মত কারও রক্তে আগুন ধরে ওঠেনি।

সবিতৃকে একবার থানায় যেতে হবে। নূতন দারোগা বদলি হয়ে এসেছে। তাঁর পুরোনো বন্ধু সে, তার সঙ্গে একবার দেখা করবেন।

নিত্যকার হাঁফানী রোগী ভূষণ বর্মণ বলেছে, "যুদ্ধের সময় সরকার তার কিছু জমি ইঁটের ভাটার প্রয়োজনে নিয়েছিল। জমির একটি ফলন্ত আম গাছের সত্ত্ব ওকে দেওয়া হয়েছিল। ভূষণের স্ত্রী বলেছিল, "সারা জীবন তো ভুঁয়ে শুয়েই কাটলো, শীতের রাত আগুন পোহাতেই কাবার হয়ে যায়, গাছের তক্তায় একটা মজবুত তক্তোপোষ তৈরী কর।"

স্ত্রী তক্তোপোষে ঘুমুবে। অদম্য উৎসাহে প্রায় বৎসর দুই টানা সময় কাঠও চিরেছিল। একখানা তক্তোপোষ হয়েও একটা সিন্দুক হতে পারবে।

ইত্যবসরে নূতন দারোগা কয়েকটি নিয়ম জারী করে ভূষণের কাঠগুলি সরকারের গুদামজাত করে ফেললো। যে জমী বিক্রী হয়ে

যায়, তার সমস্ত স্বত্ব মালিকের। ভূষণের অনুরোধে প্রাক্তন বন্ধু দারোগার সঙ্গে সবিতৃ একবার দেখা করবেন।

একটি যক্ষ্মা রোগীকে ইন্‌জেকসন দিয়ে থানার দিকে রওনা হয়েছিলেন সবিতৃ ডাক্তার। কৃষ্ণপক্ষের দিগন্তে সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় ছায়া ফেলে নেমে আসছে। উঁচু নীচু এবড়ো-খাবড়ো রাস্তায় বাঁশঝাড় আর কলাবন,—পাশে রেখে চলতে লাগলেন ডাক্তার। কখনও জমীর উঁচু আলের প্রান্তে সাইকেল হাতে নিয়ে হাঁটছিলেন। খানিকটা দূরেই থানা কলোনী দেখা যায়। দারোগা-কনেষ্টবল-ব্যারাকের স্তিমিত প্রদীপ মিটমিট করে জলছিল।

"কে-রে ভোলা নাকি?" সম্মুখে পরেশ ময়রার অনুজ ও আর একটি ছোকরা এগিয়ে আসছে। টর্চবাতি জ্বাললেন সবিতৃ। দেখতে পেলেন ওদের কাঁধে ক্যানাস্তারা টিন আর বস্তা রয়েছে।

ভোলা উত্তর দিয়ে বললো, "আজ্ঞে, আমি ডাক্তারবাবু। আপনি কোথা যাবেন?"

"আজ তো হাট নয়রে।" আগ্রহ প্রকাশ করে সবিতৃ জিজ্ঞেস করলেন। "এদিকে কোথায় গেছলি?"

ভোলা ইতস্ততঃ করছে। কী উত্তর দেবে? পিছনেই নন্দীবাবু ছিল। স্বভাবসুলভ ফিসফিসিয়ে বললো, "আপনার কাছে আর বলতে বাধা কী ডাক্তারবাবু. আপনি তো কারও ক্ষতি করেন না, আপনি দেবতা মানুষ।"

সবিতৃ মনে মনে একটু না হেসে পারলেন না। ধরা পড়েছ ভাই, তোমাদের অপূর্ব কারিকুরি। বললেন, পরেশ ময়রার মিষ্টান্নর দোকানকে চালু রাখতে গ্রামের দুধ সব উজাড় হয়েছে, অন্যান্য উপকরণ চিনি ঘি ময়দা দারোগা ছাড়া কে বিতরণ করবে বলুন?"

নন্দী ফোলাগাল ফুলিয়ে হেসে বললো, "পুলিশের র‍্যাশান জানেন তো, থরে থরে পায় ওরা, কত ঘি ময়দা, কত চিনি; বেশীর ভাগ ষ্টাফই পরেশ ময়রাকে সাহায্য করে। কালোবাজারের দর হলেও পুষিয়ে যায়, এখনকার দিনে জিনিষ মেলানই ভার।"

ডাক্তার এ যুক্তির কোনও উত্তর খুঁজে পান না। দারোগার বাড়ী যাবার উৎসাহের প্রদীপটি যেন একটি ঝড়ের ফুৎকারে নিভে গেল। ততক্ষণে নন্দী অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।

"যত সব নিশাচর, রাত্রিবেলাও প্র্যাকটিসের শেষ নেই যেন, ডবল ফী আদায়।"

আমনা সবিতৃর চেতনা কয়েকটি শৃগালের চীৎকারে চমকে উঠলো। সাইকেলটা ফিরিয়ে নিয়ে আবার ফিরতে সুরু করলেন। সহযোগিতার একটি অবর্ণনীয় দৃশ্য চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সাহায্য করবার বিচিত্র অভিযান। দুধ নেই বাজারে। দুধের শিশু দুধের অভাবে পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকবে। দারোগা র‍্যাশানে যা ঘি, ময়দা, চিনি পায় মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীকে দিয়ে সাহায্য করবে। সবিতৃ নিজের মনে একটু না হেসে পারলেন না। সাহায্যের অভিনব পন্থা। ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে ইংরাজ ও ফরাসীর ওলন্দাজকে সাহায্য। ওদের স্বাধীনতার আন্দোলনকে টুঁটি টিপে হত্যা করে অস্ত্র দিয়ে ভারতীয় সৈন্য দিয়ে সাহায্য। সাম্রাজ্য বৃদ্ধির বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধ নিয়ে লোভাতুর মার্কিনের চীনের গৃহ-বিবাদে সাহায্য। প্যালেষ্টাইনে আরবদের দাবী অগ্রাহ্য করে ফরাসী চক্রান্তে বৃটেনের সাহায্য।

একই লক্ষ্য। একই নীতি। একই ধারা। কিছুক্ষণ বাদে অর্জ্জুন সূত্রধরের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন সবিতৃ।

"অর্জুন আছ নাকি হে"।

"ডাক্তারবাবু, আপনি?" ঘরের মধ্যে থেকে অর্জুন সন্ত্রস্ত হয়ে উত্তর দিল, একটা মোমবাতি জেলে নিয়ে বাইরে এল। ডাক্তার-বাবুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে সে দুই হাত একত্রে ঘষতে লাগলো।

সবিতৃ জিজ্ঞেস করলেন, "আমকাঠের ডবল বহরের একখানা তক্তোপোষ করতে কত খরচ পড়বে রে অর্জুন? কাঠ তুই দিবি।"

কিছুক্ষণ মনে মনে হিসাব কষে নিয়ে অর্জুন বললো, "আগের দিনে আট দশ টাকাতেই হতে পারতো, এখনকার দিনে বিশ বাইশ পড়বে।"

"বেশ মজবুত করে তৈরী করিস।" পকেট থেকে কয়েকটা টাকা বায়নাস্বরূপ বের করে দিয়ে সবিতৃ ওর উঠোন থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

পনেরো

মৃণালিনীর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সবিতৃর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মুকুটকে বলেছিলেন, "অজস্র কাজ পড়ে গেলরে, সেই সাতটায় লাইনে বের হওয়া, রাত দশটায় ফেরা, বোর্ডের ডাক্তারকে নিয়ে যাস।"

"টাইফয়েডের মরশুম আসন্ন, কাজ যাতে অচল হয়ে না পড়ে সেজন্য প্রত্যেক কর্মচারী এবং তাদের আত্মীয়স্বজনকে ইনঅকোলেশন দিতে হবে।

ত্রিশ চল্লিশ মাইল লাইন তদারক করতে হয় সবিতৃকে।

কয়েকদিন পরে সবিতৃ মৃণালিনীর আশ্রমে যেতে পারলেন। আশ্রমে আরও দুখানা আটচালা ঘর বাঁধা হচ্ছিল, মৃণালিনী দাঁড়িয়েছিলেন। সহাস্যে সবিতৃকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "আসুন ঠাকুরপো, আপনার কাজ মিটলো তো? মুকুটের কাছে শুনেছি আপনার স্নান খাওয়ারও অবসর ছিল না, রেলের কামরাতেই দিন কেটেছে।"

"আপাততঃ মিটেছে বউদি।" স্মিতমুখে সবিতৃ বললেন, "রেলকর্মী অচল হয়ে পড়লে, রেলগাড়ী চালু রাখবে কে?"

মৃণালিনী বললেন, কতটুকুই বা সময় আপনার? এখুনি তো চলে যাবেন, আমার কথা কিছু শুনে নিন।"

"বলুন বউদি।"

"এবার ফসলে কিছু টাকা পেয়েছিলুম," উজ্জ্বল প্রদীপ্ত মুখে মৃণালিনী বললেন, "এই চালাঘর দুখানা তুলছি। একটা হবে পাঠাগার,

একটা স্কুল। সব বয়সের ছেলেমেয়েরা এখানে লেখাপড়া শিখবে। বিদ্যুৎ, লাবণ্য, কোহিনুর মুকুট ওরা ওদেরকে লেখা পড়া শেখাবে। লাইব্রেরীর বইগুলো আপনাকে পছন্দ করে কিনে দিতে হবে।"

সবিতৃ সায় জানিয়ে বললেন, "কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে আপনার লাইব্রেরীর বই এনে দেব। যে মেয়েটির অসুখ হয়েছিল, সে ভালো হয়েছে বউদি ?"

মৃণালিনী এবার সবিতৃকে একটু দূরেই কুটীর-শিল্পের প্রাঙ্গণের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, "এবার আপনাকে আমাদের আশ্রমের কাজকর্ম আরও কতদূর এগুলো দেখাই। সে মেয়েটির অসুখ ভালো হয়ে গিয়েছে। আজ ভাত দিয়েছি।" বড় একখানা আটচালা ঘরের মধ্যে মেয়েরা চরকায় সুতো কাটছে, তাঁতে কাপড় তোয়ালে বোনা হচ্ছে। সেলাইর কলে কাটা কাপড় সেলাই চলছে। আর একদিকে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বাঁশ চিরে ডালা-চেঙারী-মোড়া ইত্যাদি তৈরী করছে। মাটীর পুতুল হাঁড়ি কলসীও তারা গড়ছে। আধুনিক রুচিমত একটি ব্যায়ামগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

খানিকটা দূরে মাঠে ঝলমল করছে সবুজের শস্য সমারোহ। মটর, কলাই, আলু, নানা সব্জী অজস্র ফলনে ফলেছে। আবেগ উদ্বেলিত দৃষ্টিতে ওই দিকে তাকিয়ে ছিলেন সবিতৃ। মুগ্ধ আকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন, "মাটি লক্ষ্মী, মাটি জননী।"

মৃণালিনী ভক্তি উদ্বেলিত হৃদয়ে মাটির উদ্দেশে একটি প্রণাম জানিয়ে বললেন, "ওই যে দেখতে পাচ্ছেন সুপারী আর কলাবাগান, ঠিক ওর সামনেই আমাদের ধানের জমি, হৈমন্তিক ফসল এবার বেশ ভালো ফলেছে।"

আগ্রহ প্রকাশ করে সবিতৃ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের কী কিষাণ একেবারেই নেই বউদি ? সব আশ্রমের মেয়েরা করে ?"

"হ্যাঁ ঠাকুরপো, সব মেয়েরাই করে।" মৃদু হেসে মৃণালিনী বললেন, "ওরা বিপদে অসময়ে পুরুষের মুখাপেক্ষী না হয়ে যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে এইটেই আমার উদ্দেশ্য। দেশে যদি কখনও সুদিন ফিরে আসে একটা ডায়েরী ফার্মও আমার করবার ইচ্ছে আছে।"

"আর শুনুন বউদি, কয়েকটা পুকুর করার ব্যবস্থা করবেন। গ্রামে বড় জলের কষ্ট, মাছের অভাবও কিছু মিটবে।"

মৃণালিনী বললেন, "দেখুন ঠাকুরপো, আমি উপযুক্ত লোক পাই না পরামর্শ করবার, বুদ্ধি নেবার। আপনি আশ্রমের চিকিৎসার ভার তুলে নিন না, আপনি যদি আমার পাশে থাকেন, আমি একটা হাসপাতালও প্রতিষ্ঠা করতে পারবো।"

সবিতৃ বললেন, "আমি আসবো বউদি, আপনি কিছুদিন অপেক্ষা করুন, দাসত্ব আমার মেরুদণ্ডে যেন ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে, ধাতে আর সইছে না।" চাএর সঙ্গে চিঁড়ে আর মুড়ির মোয়া সবিতৃর সম্মুখে রেখে নৈরাশ্যের কণ্ঠে মৃণালিনী জিজ্ঞেস করলেন, "কিছুদিন অপেক্ষা কেন করতে বলছেন ঠাকুরপো? যত তাড়াতাড়ি পারেন ইস্তফা চিঠিখানা লিখে ফেলুন না।"

সবিতৃ বললেন, "এখনও আমরা মিলিটারী ব'নে আছি কিনা! বণ্ডে সই করেছিলুম, সার্ভিসে অর্ডিনেন্স রয়েছে, চাকরি ছাড়লে কোর্ট মার্শালের হবে।"

"কমিশন কবে তুলে নেবে?" ব্যগ্রতা প্রকাশ করে মৃণালিনী জিজ্ঞেস করলেন।

"কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, কমিশন তুলে নেবার জন্য আমাদের দরখাস্ত দিতে হবে। কিন্তু আমার সহকর্মীরা কেউ রাজী নয়। ওঁরা বলেন, "আমরা যেচে কেউ কমিশন নিইনি, তোমাদের প্রয়োজনের সময় সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিলে, আজ তোমাদের বিজয়

উৎসবের দিনে আমাদের ফিরিয়ে দিতে হবে সেদিনের সে আহ্বান। ইতিমধ্যে যুদ্ধ Allowance তুলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দুর্মূল্য বাজারের আগুন এখনও দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। তাই সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে আমাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনার আশ্রমে অবশ্যই আসব।"

এই সময় কোহিনুর বারান্দায় এসে উঠলো। সবিতৃ ওর চটির শব্দে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "কোহিনুর যে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? দুপুরবেলা তোমার হোটেল বন্ধ না?"

"দুই ঘণ্টা বিশ্রাম নি' কাকা।" কোহিনুর একটু ইতস্ততঃ করে বললো, "বিদ্যুৎদার তো ডিউটি ছেড়ে আসবার উপায় নেই; ওর কোয়াটারে বসে ওর সঙ্গে মুকুট আমি বউদি এই প্রাচীর-পত্রগুলো লিখে ফেললুম।" কলাপাতার মড়ক থেকে ও একতাড়া প্রাচীর-পত্র বের করে দেখালো।

সবিতৃ দেখলেন, লাল নীল কালীর অক্ষরে কোনওটিতে লেখা, "জমি মানুষের প্রাণ, জমিকে অনাদর করিও না।" "তুলোর আবাদ কর।" "ঘরে ঘরে চরকায় সুতা কাটিয়া তাঁতে কাপড় তৈরী কর।" "চাকরীর মোহে আকৃষ্ট হইও না।"

স্মিত হেসে সবিতৃ বললেন, "বিশ্রামের পন্থাটা তোমার চমৎকার কোহিনুর।"

কোহিনুর বললো, "গণ-জাগরণটা এত কঠিন কাকা, নানা দিক দিয়ে তাকে কার্যকরী করতে না পারলে কোনও ফল হতে চায় না।"

এই সময় লাইন-খালাসী পুলিন, দেবেন, মহেশ এসে জানালো, বেলা তিনটে থেকে ওদের রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত ডিউটি; তারপরে প্যাম্ফ্লেটগুলো ওরা গাছের গায়ে গায়ে সেঁটে দেবে। কোহিনুর জিজ্ঞেস করলো, "কালকের পনেরোখানা লাগিয়েছিলে?"

"আজ্ঞে দিদিমণি, গোপালপুরের কাজ শেষ হয়ে গেল।" ওদের আর একবার সতর্ক করে বিদায় দিয়ে কোহিনুর বললো, "কোনও গাছের গুঁড়ির গায়ে একটু ভালো করে সেঁটে দিও, ছোট ছেলেরা যেন ছিঁড়ে ফেলতে না পারে।"

মৃণালিনী তখন সবিতৃকে বলছিলেন, "কোহিনুরকে পাত্রস্থ করা আমাদের একটা কাজ তো ঠাকুরপো; P. W. I. ছেলেটি কেমন? আমাদের স্বজাতি যখন—" বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপনে কোহিনুর একটু চঞ্চল হয়েছিল, সলজ্জ ভঙ্গিমায় ঠোঁটের বঙ্কিম রেখাটি কেঁপে উঠলো, মুহূর্ত্তে নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে অনুযোগ জানিয়ে বললো, "কোনও দাসকে আমি বিয়ে করতে পারব না কাকা।"

বিয়ে সে করবে না এমন কথা বলে না। মেয়েদের জায়া ও জননী হবার মধ্যে মেয়েদের জীবনের দায়িত্বের কর্ত্তব্য ও সার্থকতা রয়েছে বৈকি! বিবাহ ব্যক্তিগত জীবনের পরিতৃপ্তির প্রয়োজনে নয়, উন্নত বলিষ্ঠ ও সুসংস্কৃত সমাজ গঠনের জন্য বিবাহ। তাই কোহিনুর বিবাহকে অস্বীকার করে না। মৈনাকের সুকুমার সুন্দর আনন-শ্রী ওর মনে রেখাপাত করেছিল। একটু অনুরাগের রং ওর নব-মুকুলিত পাপড়িগুলিকে বুঝি রাঙিয়ে দিয়েছিল। তবে দাসত্বকে সে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে।

স্বভাবসুলভ স্নিগ্ধ কণ্ঠে সবিতৃ বললেন, "Oh no, no, তুমি দাসকে বিয়ে করবে কেন? তোমার নিজের আদর্শে প্রভাবান্বিত করবার ক্ষমতা যখন তোমার অপরিসীম, তুমি তাকে দাসত্ব থেকে টেনে তুলে নাও।"

এ কথা সত্য যে মৈনাক অভাববোধে দাসত্ব করে না। প্রচুর সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য ওর রয়েছে। সরকার বাহাদুরের প্রতি একান্ত আনুগত্যবশতঃ করে। রাজকীয় মর্য্যাদার প্রতি ওর একটা মোহ বোধ রয়েছে।

কোহিনুর নিরুত্তর। একটু গৌরবে, একটু খুশির শিহরণে ওর সলজ্জ মুখটা আরক্তিম হয়ে উঠলো। সবিতৃর মনে পড়লো এমনই সলজ্জ সুন্দর অনুরাগ একদিন তিনি লাবণ্যর মুখের ছবিতেও দেখেছিলেন। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এবার আমি যাই বৌদি, আমার ডিউটির সময় হোল।" সবিতৃর সঙ্গে সঙ্গে মৃণালিনীও উঠান পার হয়ে খানিকটে এগিয়ে এলেন, জননীর স্বভাবসুলভ ব্যাকুলতা প্রকাশ করে বললেন, "আপনি ছেলেটির সঙ্গে দেখা করে একটা ঠিক করে ফেলুন ঠাকুরপো; এই জেলাতেই যখন তার বাড়ী, অসুবিধেও হবে না।"

সবিতৃ বললেন, "ধীরে ধীরে আমাদের এগোতে হবে বউদি। ছেলের তরফ থেকেও প্রস্তাবের জন্তে অপেক্ষা করতে হবে। ওর চাকুরী-জীবনের প্রতি কোহিনুরের অবজ্ঞা দেখলেন তো? এমন দিন আসুক —দাসত্বের প্রতি ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠুক তখন বাধা-নিষেধগুলোর অবসান হয়ে যাবে।" ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, "আর নয় বউদি, বড্ড দেরী হয়ে গেল।"

ষোল

ভারতবর্ষের পটভূমিতে নব জাগরণের অভ্যুত্থান। কলিকাতা মহানগরীকে চঞ্চল করে তুললো। আবার বৃটিশ শাসনের কলঙ্ক অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি, আজাদ-হিন্দ্ সেনানীর মুক্তির অভিযানকারীদের উপর দমন-নীতির নির্মম অস্ত্র প্রয়োগ। নিরস্ত্র, শান্ত জনতার উপর নিষ্ঠুর শাসনের সশস্ত্র অভিযান। অহেতুক গুলিবর্ষণ, জুলুম, অত্যাচার আর উৎপীড়ন। বণিক-সভ্যতার অভূতপূর্ব নিদর্শন। তরুণের তাজা রক্তে কোলকাতার মাটি আবার রাঙা হয়ে উঠলো। জালিয়ানওয়ালা-বাগের বর্বর পটভূমিকা আবার বুঝি নেমে এলো।

এইমাত্র মেল ট্রেণে খবরের কাগজ পৌঁছেচে। সবিতৃ পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখলেন, পুলিশের গুলিতে নিহত তরুণ রামেশ্বরের ছবি, একুশ বছরের ছেলে,—সুকুমার সুন্দর; আননে বিপ্লবের বহ্নি-শিখা যেন ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। দলে দলে বিপ্লবী তরুণগণ অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দিতে দ্বিধা বোধ করেনি। "Give me blood, I promise you freedom"—বৈরাগ্যের তপস্যায় বুঝি জননীর মুক্তি নেই। চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল সবিতৃর। পাশেই শ্রমিক বস্তিতে বিবাদ লেগেছে। পারিবারিক বিবাদ। নন্দ খালাসীর স্ত্রী স্বামীকে একটি গেলাস ছুঁড়ে মেরে আহত করেছে। সবিতৃ উঠে দাঁড়িয়ে ধুতির কোঁচা গুছিয়ে নিয়ে গায়ে একটা কামিজ চড়িয়ে রওনা হয়ে পড়লেন। চাকর দেবেনকে বললেন, "হস্‌পিট্যাল থেকে তাড়াতাড়ি করে ফার্ষ্ট-য়েড বাক্সটা পাঠিয়ে দে।"

চল্লিশ পঞ্চাশটি ঘর নিয়ে দুই সারি লম্বা ব্যারাক। প্রত্যেক মানুষের অংশে একটু খুপরি আর একটু দাওয়া পড়েছে। দুই সারির মধ্যে সারা ব্যারাকের আবর্জনা, ছাই-এর স্তূপ। শিশু ও পশুর মলমূত্র, মাছির ভন্‌ভনানি যেন নরক-কুণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। সবিতৃ নন্তর দাওয়ায় পৌঁছুলেন, ইতিমধ্যে যে ঝড় বয়ে গেছে, তার চিহ্ন আঁকা নন্তর বিপর্যস্ত সংসারে। আহত নন্তর অচৈতন্য অবস্থা। ওর কপাল বেয়ে গড়াচ্ছে রক্তের ধারা; ছেলে-মেয়েরা হাঁউমাউ চীৎকারে কাঁদছে। পড়শীরা জমা হয়েছে। ডাক্তারকে দেখে নন্তর স্ত্রী ঘরের থেকে বের হয়ে এসে যেন ক্ষুব্ধ অভিমানে ফেটে পড়লো। অভিযোগ জানিয়ে বললে, 'দেখেন বাবু, কেরানী বাবুর কাছে র‍্যাশন কার্ড বন্ধক ধরে নিয়েছে; ছেলেমেয়েগুলো নিয়ে প্রায় উপোষ চলে, মানুষের কাছে চেয়ে চেয়ে কতদিন যায়? আপনার দেবু এই সেদিন চাল ডাল কত কী দিয়েছে।"

নন্তর মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে বললো "বাবার দোষ নেই, ডাক্তারবাবু, ঠাকুরমায়ের ঘাট-খরচে অনেক টাকা কাবুলীর কাছে দেনা হয়ে গেছলো। কার্ড বন্ধক না রেখে উপায় ছিল না।

নিরুত্তর সবিতৃ। নিঃশব্দে ব্যাণ্ডেজ করতে লাগলেন। তারপর একটা ইনজেকশন করে সবিতৃ নন্তর চিবুক নেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে নন্ত, কেমন লাগছে, তাকা' আমার দিকে।' নন্ত একবার চোখ মেলে তাকিয়ে আবার পাশ ফিরে শুলো। নন্তর স্ত্রীর চোখে তখন জল টলমল করছিল। সামলে নিয়ে বললো, "বাবু, উ ভালো হবে তো?"

রুক্ষ কণ্ঠে সবিতৃ উত্তর দিলেন, "ভালো হয়ে উঠবে বইকি, তবে এ ভাবে নিরপরাধ মানুষের উপর তোমার জুলুম করা উচিৎ হয়নি। যারা তোমাদের মুখের ভাত কেড়ে নিচ্ছে তাদের সামনে গিয়ে বলা।"

ভারী গলায় নন্তর স্ত্রী বললো, 'অনেক দুঃখে ধৈর্য্য হারিয়ে

ফেলেছিলুম বাবু, কার্ডে কাপড় পাওনা ছিল, অথচ কার্ড আটকে রাখলো, তারপর···"

'তারপর তোমরা উলঙ্গ হয়ে থাকবে, লজ্জা নিবারণ করতে আত্মহত্যা করবে, আর ওরা মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়েই যাবে দিনকে দিন।"

ইত্যবসরে নন্তর সহকর্মী মহেশ, ভোলা, দুর্গা যেন জলন্ত আগুনের মূর্তিতে সামনে এসে দাঁড়ালো।

"বাবু, আমরা আর অত্যাচার সহ্য করবোনা। ওই কেরাণীবাবুকে ট্রলি শুদ্ধু উলটে ফেলে দিব। লাইনের বণ্টু উপড়ে ফেলব, লাইনের পয়েন্ট বিগড়ে রাখবো।" উত্তেজনায় থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো ওরা।

সবিতৃ ঔষধের বাক্সে সিরিঞ্জ ও অন্যান্য জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে বললেন, "আচ্ছা তোরা নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাপুরুষের মত পিছন থেকে কেন আক্রমণ করবি বলতো। সামনে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস নেই?"

সবাই একসাথে বলল, "তোমাদের অত্যাচার আর আমরা সহ্য করব না।" উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওদের মুখ। বললো, "সেই ভালো বাবু, সামনে গিয়ে আমরা বন্ধকী কার্ডগুলো ছিনিয়ে আনবো।" বস্তি থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সবিতৃ বললেন, "অন্যায়কে যত স্বীকার করবে ততই সে সাপের মত ফণা দেখাবে।" সবিতৃ এবার রেল লাইন পার হয়ে ক্যাবিন-য়্যাসিষ্ট্যান্টের কোয়ার্টারে গিয়ে পৌছুলেন। দুখানা ঘর, এক ফালি বারান্দা, নোংরা উঠোন; রুগ্না স্ত্রী, পাঁচ সাতটা অস্থি চর্মসার ছেলেমেয়ে,—রেল-বাবুদের পেটেন্ট সংসার। সমরবাবু উঠোনে ছাইয়ের গাদা থেকে কয়লা বেছে বের করছিলেন।

"এই যে ডাক্তারবাবু, আসুন। বড় ছেলেটাকে আপনি কয়েকটা কালাজ্বরের ইনজেকসন দিয়ে দিন।"

"হাসপাতাল থেকে নিয়ে এলেন কেন ?" বিস্ময় প্রকাশ করে সবিতৃ জিজ্ঞেস করলেন, "সেখানে ট্রিট্‌মেন্ট ফ্রী, নার্সিং ভালো।"

"কিন্তু ফুড-চার্জ দিতে দিতে যে বাড়ীশুদ্ধ উপোষ করবার উপক্রম।" ক্যাবিন-য়্যাসিষ্ট্যান্ট বলতে লাগলেন, "গুড্‌স্-ক্লার্ক ছিলুম—দুর্নীতির সুড়ঙ্গ-রাস্তায় ছিল অবাধ গতিবিধি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ ছিল অবারিত। কিন্তু অন্যায় আর অধর্মের জ্বালাবোধ যেন গায়ে জ্বলন্ত আগুনের ফোস্কা তুলে দিতে লাগলো। বিরক্ত হয়ে ক্যাবিন-ম্যান হয়ে চলে এলুম। গোনা মাইনের টাকা; প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করছি ধর্ম আর নীতিবোধ, মানবতা আর ন্যায়পরায়ণতা। র‍্যাশন আনতেই টাকা ফুরিয়ে যায়।"

সবিতৃ কী উত্তর দিবেন ?

রুগ্ন ছেলেটিকে পরীক্ষা করছিলেন, ষ্টেথেস্‌কোপটা ভালো করে কানে ঢুকিয়ে দিলেন।

সতেরো

আসন্ন-প্রসবা জবা। মেটে রং, শীর্ণ হাড় বের-করা চেহারা, সেই পরিমাণে পেটটা অস্বাভাবিক ফুলে উঠেছে, দুধের ভারে ঝুলে গেছে পালান। কী সৌভাগ্য ওর, এবার ও মুলতানী সন্তানের জননী হবে। বালতী ভরতি দুধ দেবে। দুধের স্বাদ খুকি তো জানেই না। তিন বছরের পঙ্গু মেয়ে, ফর্সা রং, টানা টানা চোখ, মেরুদণ্ড সুগঠিত হতে পারেনি, সরু লিকলিকে হাত-পা। সবিতৃদার অজস্র অর্থব্যয়ে আর চিকিৎসার নিপুনতায় অনেকটা ও সুস্থ হয়ে উঠেছে। পা পা হেঁটে বেড়ায়, একটানা ঘণ্টা দুই তিন বসে থাকতেও পারে। আশার গান সে এখনও অদম্য উৎসাহের সঙ্গে গেয়ে চলে :

বাটী ভরা দুধ খাব,
দুধ খেয়ে মোটা হব,
হেঁটে হেঁটে বেড়াব।

অনর্গল উচ্ছ্বাসে ও আবোল তাবোল বকে যায়। হয়তো বা লাবণ্যর খুকি একদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু সবিতৃদার অপরিশোধ্য ঋণ সে কোনও দিন শোধ করতে পারবে না। শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়, কৃতজ্ঞতায় ওর অন্তর চিরদিন আপ্লুত থাকবে। 'শ্রদ্ধা, ভালোবাসা'—লাবণ্য সঙ্গোপন মনে একটু বিষন্ন হাসি না হেসে পারে না। একি শুধু ওর কৃতজ্ঞ মনেরই অবদান ?

গর্ভবতী জবার জন্য ওর সতর্কতার অন্ত নেই। সামনের মাঠে সকলকে ঘাস; জবা বাঁধা থাকে। গো-গ্রাসে চিবুতে চিবুতে ও

গে বাধা আছে ভুলে যায়। নিজের গণ্ডিটুকু ছাড়িয়ে যেতে চায়, দড়ির টানে আঘাত পেয়ে চকিত হয়ে ওঠে। বার বার দাঁড়ক ওর বদলে দেয় লাবণ্য। এ ছাড়া, নির্জন দুপুরে লাবণ্য ভদ্রলোকের স্ত্রীর আব্রু রক্ষা করে এক জাতীয় বন্য কাঁটা গাছ সংগ্রহ করে আনে। কাঁটার সঙ্গে জমির লাউ সিদ্ধ করে ফ্যান মিশিয়ে লবণ দিয়ে এক উপাদেয় খাদ্য হয়। গরুটা পরম তৃপ্তির সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে চোঁ চোঁ করে খেয়ে ফেলে। শ্রমিক বস্তির অধিকাংশ লাইন-খালাসী ওদের ভাতের মাড় বয়ে দিয়ে যায়।

লাইন দিয়ে হুস্ হুস্ শব্দে প্যাসেঞ্জার গাড়ী, মালগাড়ী, মিলিটারী গাড়ী ট্রলি ইত্যাদি বের হয়ে যায়। বিদ্যুৎ গেট খোলে আবার বন্ধ করে নীল লাল পাখা ওড়ায়। জবাকে আদর করে পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। মধ্যে মধ্যে ওকে সতর্ক করে দিয়ে লাবণ্য বলে. "দেখো. রেল-লাইনের মধ্যে অনেক ঘাস হয়েছে, চলে না যায়। ওর বড্ড ক্ষিদে, আবার রেল-লাইনে কাটা না পড়ে।"

"তাছাড়া কারও জমিতে গেলে বেদম প্রহার খাবে,—খোঁয়াড়ে চালান দেবে।" স্বামী-স্ত্রী ওদের দুজনের আশঙ্কা আর সতর্কতার অন্ত নেই।

সেদিন বিকেলবেলা লাবণ্য সদ্য তুলে আনা কাঁটা ঘাসগুলি শিলে পিষছিল। এই সময় কোহিনুর উঠোনে এসে দাঁড়াল। হাতে ওর কিছু কাগজ-পত্র রয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে লাবণ্য বললো, "এস ভাই, কতদিন আসনি।"

"সময়ের বড় অভাব বউদি, বারান্দার এক প্রান্তে বসে পড়ে কোহিনুর বললো, "এত কাজ পড়ে গেছে ভাই, বিদ্যুৎদা কোথায়?"

"এই তো হাটে গেলেন, কিছু জামা সেলাই হয়েছিল, যদি

কিছু পাওয়া যায়। রাজবন্দী মণ্টুদাব বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, তিনদিন তাদের খাওয়া জোটেনি!”

“মণ্টুদার দেশ-সেবার এই তো যোগ্য পাওনা।” কোহিনুর ঠোঁটের বাঁকা ভঙ্গিমায় বললো, ‘তবু আমাদের অহিংস নীতিকেই হজমিগুলি করে নিতে হবে।”

লাবণ্য বললো, “মহাত্মা গান্ধী বলেন, আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র নেই, নিরস্ত্র দুর্বল আমরা, কী নিয়ে সম্মুখ-সমরে লড়াই করবো।”

“অস্ত্র আমরা নিজেরাই। প্রত্যেকটি মানুষকে আগুনের শিখার মত জ্বলে উঠতে হবে। অন্যায়, অপমান, অত্যাচার—তারই দহনে পুড়ে ছাই হবে।” উঠে দাঁড়িয়ে কোহিনুর বললো, “তাই এবার আমরা আমাদের আশ্রমেব ব্যায়াম শিবিরে নারী-সেনা তৈরীতে মন দিয়েছি।”

উৎসাহ-উজ্জ্বল মুখে লাবণ্য বললো, “কর্ম-ক্ষমতা যে তোমার অসীম, তা অস্বীকার করবার নয়।”

“কর্ম-ক্ষমতা আমার আছে কিনা আমি জানিনা বউদি”, কোহিনুর বললো, “অন্তরের গভীরে আমি এক প্রেরণা অনুভব করি। কী যেন এক মন্ত্র আমার কানে আহ্বান জানাচ্ছে!” মুগ্ধ বিস্ময়ের অপলক দৃষ্টিতে লাবণ্য ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। বললো, “তোমার কর্মক্ষমতা যে অসাধারণ তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।” লাবণ্য এবার স্নিগ্ধ কৌতুকে হাসলো। অসাধ্য সাধন তুমি করেছ। মজুমদাব সাহেবের নীতি বদলেছ, মতি বদলেছ, সেই দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ কী শান্ত, কী সমঝদার। প্রত্যেক মানুষের অভাব অভিযোগ কান পেতে শোনেন। হৃদয় দিয়ে বিচার করেন, সাধ্যমত প্রতিবিধান করেন। প্রথম প্রথম আমরা তো বুঝে উঠতে পারিনি, কার মন্ত্রে রত্নাকর বাল্মিকী হয়ে উঠলো।”

একটু সলজ্জ হাসলো কোহিনুর। "একদিন ওঁকে আমি বলেছিলুম, একটু দয়া নেই, মমতা নেই, একবিন্দু ভালোবাসা নেই...।"

"তোমার চাবুকেই ওঁর ঘুম ভেঙেছে।"

"সত্যি বউদি, ও গভীর ঘুমের মধ্যেই আচ্ছন্ন ছিল।" আক্ষেপের কণ্ঠে কোহিনুর বললো, "এমন কত মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, জাগানোর অভাবেই জাগে না। মৈনাকের স্বভাবে এমন একটা মাধুর্য লুকিয়ে ছিল তুমিও ওর সাথে মিশলে মুগ্ধ না হয়ে পারবেনা।"

"আমি মুগ্ধ হলে তুমি কী বরদাস্ত করতে পারবে ভাই।" কৌতুকে ঝকঝক করছিল লাবণ্যর চোখ দুটো।

মৃদু মৃদু হাসছিল কোহিনুর। বললো, "তুমি আজকাল মনস্তাত্বিক হয়ে উঠলে নাকি বউদি?"

লাবণ্য বললো, "পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মনোস্তাত্বিক বুদ্ধির আমল দিচ্ছে কে? তবে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি তোমরা দুজনেই দুজনকে ভালোবাস।"

"এবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো কোহিনুর। "থামো বউদি, অত ঠাট্টা কোরনা, তাহলে আর তোমার বাড়ী আসা হবেনা।" বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে ও বললো, "বিদ্যুৎদার সঙ্গে দেখা হোলনা, ওঁকে বলে দিও নাইট-স্কুলে আজ ওঁর ডিউটি পড়েছে।"

রেল-লাইনের ধার দিয়ে যেতে যেতে লাবণ্যর কথাগুলি ভাবতে ওর ভালোই লাগছিল। আনমনা মনে মধুর একটা আমেজ লেগেছিল। হঠাৎ লাইনে ট্রলির শব্দে ও পিছন ফিরে দেখলো, মৈনাক ট্রলিতে এদিকে আসছে। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে মধুর হাসলো, হাত তুলে অভিবাদন বিনিময় করল।

ইতিমধ্যে ট্রলিটা থেমে গিয়েছিল, মৈনাক বললো, "আসুন আপনাকে দোকানে নামিয়ে দেব।"

"দোকান ছাড়িয়েও আমাকে যেতে হবে মৈনাকবাবু।" কোহিনুর স্মিত মুখে ওর পাশে বসে বললো, "ওদিকটায় আমাদের স্কুলের একটা শাখা খুলছি কিনা, কিছুক্ষণ ওখানে কাজ করব।"

"মুকুন্দ, সিগন্যাল ঠিক আছে, ইষ্টিশন ছাড়িয়ে চলো।"

"বাঃ, আপনার কাজের যে ক্ষতি হবে, মৈনাকবাবু!" অনুযোগ করলো কোহিনুর।

"নিক্তির চুল-চেরা হিসাব-নিকাশে এতদিন তো কাজেরই ক্ষয়-ক্ষতি দেখে এলাম কোহিনুর দেবী।"

মৈনাক ওর বড় বড় চোখের দৃষ্টি মেলে তাকালো। "আপনার জীবন কত সুন্দর, ত্যাগ আর সেবায় যেন ফল্গুধারা।"

"অত উঁচুতে আমাকে তুলে দেবেন না মৈনাকবাবু," কোহিনুর বললো। ট্রলি ষ্টেশন ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। মৈনাক ও কোহিনুর দুজনেই নীরব। ওদের দুজনের শুধু দুজনকে অনুভব করতে ভালো লাগছিল। আরও ভাল লাগছিল ভাবতে, ওদের এ চলা যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্যে হয়। যদি চিরকালের জন্যে হয়!

আঠারো

কোহিনুর ফিরে যাবার পর ওর কথাই ভাবতে ভালো লাগছিল লাবণ্যর। কী নির্ভীক, স্পষ্টভাষিনী মেয়ে। সঙ্কোচ নেই। কুণ্ঠা নেই, জড়তা নেই, কোথাও ঠোক্কর খেয়ে থেমে যায় না সে। খুকি ঘুম থেকে উঠে চোখ ঘষতে ঘষতে আবার মায়ের কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিল। ওকে আদর করে চুলগুলো গুছিয়ে দিতে দিতে লাবণ্য বললো, "খুকি হবে কোহিনুর পিসীর মত, কী বলিস ?"

খুকির চোখে আবার তন্দ্রা নেমে এসেছিল। জড়িতকণ্ঠে বললো, "জবা পিসী মস্ত বাছুর দেবে, মা।"

"দূর বোকা মেয়ে," লাবণ্য খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

এই সময় বিদ্যুৎ হাট থেকে বাড়ী এল,—একটু পরিশ্রান্ত ভঙ্গিতেই দাওয়ায় বসে বললো, "কী লাবু, এত খুশি যে,—দরিদ্রের ঘরে হাসি-মশকরা তো প্রায় উবেই গেছে।

লাবণ্য আবার উচ্ছ্বসিত ভাবে হাসতে হাসতেই বললো, "কোহিনুর এসেছিল, কতকগুলি কাগজ-পত্র দিয়ে গেল। বললো, তোমার আজ নাইট স্কুলে ডিউটি আছে। মেয়েকে জিজ্ঞেস করলুম, কোহিনুর পিসীব মত মেয়ে হবি তুই, ও বলে জবা পিসী মস্ত বাছুব দেবে।"

বিদ্যুৎও একটু না হেসে পারলো না। বললো, "অবচেতন মনের কথা মানুষ এমনই অজান্তেই প্রকাশ করে ফেলে লাবু। অবচেতন মনের তাগিদ গোপনে গোপনে কাজ করে যায় বলেই শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও এগিয়ে চলার ছন্দে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, না।"

মনোযোগ সহকারে কোহিনুরের দিয়ে যাওয়া কাগজ-পত্রগুলো

দেখতে লাগলো বিদ্যুৎ। কতকটা আপন মনেই বললো, "চাকরীটা এবার খতম না হয়ে যায় না। যা দুর্মূল্য আর দুষ্প্রাপ্য বাজার; র‍্যাশানের জন্যেই মানুষ বেঁচে আছে।"

বিস্ময় প্রকাশ করে লাবণ্য জিজ্ঞেস করলো, "তোমাদের নাইট-স্কুলের কথা পুলিশে জানাজানি হয়ে গেছে নাকি।"

'নাগো, না, বিদ্যুৎ বললো, "নন্দী হাটে গেছলো, আমি জামা-গুলো বেচছিলুম। এগিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বললো, "তা বেশ করছ, আজকালকার দিনে উপরি না হলে চলে কী!"

আমি বললুম; "এসব আমার নয়, একটা দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করতে হয়, কে কার কথা শোনে বলো; বলতে লাগলো, তা বেশ, সরকারী চাকরী যখন করছ একটা প্লট না সাজিয়ে রাখলে চলে কী? দুদিকে রোজগার করা যখন নিয়ম নয়।"

"কী আশ্চর্য", আক্ষেপের কণ্ঠে লাবণ্য বললো, "বিচিত্র জীবন-দৈন্য।"

বিদ্যুৎ বললো, "আমি আর ধৈর্য ধরতে পারিনে, বলেছি, তাই যদি আপনি মনে করেন, জানিয়ে দেবেন বড় সাহেবকে। সামনে মুখোমুখী আঘাত হানবার যদি স্পর্ধা না থাকে ,পছনের দরজা দিয়ে বেনামী চিঠি তো আপনার হাতের মুঠোতেই রয়েছে।"

চকিত কণ্ঠে হেসে উঠলো লাবণ্য। বললো, "ঠিক উত্তর দিয়েছ। চাকরী যায় যাবে, আমরা কোহিনুরদের আশ্রমে চলে যাবো। সেখানে খেটে-খুটে যাহোক করে চলে যাবে।"

মুগ্ধ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিদ্যুৎ বললো, "এবার আমি মনে বেশ একটা জোর পেলাম, লাবু।"

লাবণ্য ততক্ষণে ওর খাবার আসন পেতে দিয়ে, একটি সরু মোমবাতী সামনে জেলে রেখে বললো, "তোমার আট-টার গাড়ীর

সময়ও হয়ে এল। এইটুকু মোমবাতী কখন নিভে যাবে, তুমি খেয়ে নাও।"

বিদ্যুৎ হাতমুখ ধুয়ে এসে খেতে বসেছে। ডাল আর আলু-পেঁয়াজের চচ্চড়ি। অত্যন্ত হিসেব করে খরচ করতে হয়। ভাত পাতে ফেলে রাখলে লাবণ্য দুঃখ করে। কিন্তু হিসাব-নিকাশের অভ্যেস বিদ্যুতের আদৌ নেই। ডালের মধ্যে প্রায় সব ভাতগুলো টেনে নিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বিদ্যুৎ বললো, "আলো আর আমাদের কী হবে বলো, র‍্যাশান কার্ডে তাই আমাদের তেল বরাদ্দ নেই। পশু আমরা। সন্ধ্যে নামবে, আমরাও গর্তে ঢুকে পড়ব।"

লাবণ্য বললো, "ওদিকে শুনতে পাই, মাড়োয়ারীর গুদামে, থানার আর বেলের ষ্টোর-রুমে টিনের পর টিন বোঝাই তেল রয়েছে। কারও স্পর্শ করবার অধিকার নেই।"

"কালো-বাজারের সুড়ঙ্গ থাকতে কার আর স্পর্শ করবার স্পর্ধা থাকবে বলো?" বিদ্যুৎ একটু উত্তেজিত ভাবেই বললো, "নিরীহ মানুষের বুকে পুলিশের গুলি চালাবার ক্ষমতা যথেষ্টই আছে, মহামান্য সরকারের কালো-বাজারকে সায়েস্তা করবার কর্তব্যবোধ নাই-বা থাকল।" লাবণ্য খুকীকে খাইয়ে দিতে বসেছিল। বিদ্যুতের থালার দিকে চোখ পড়তে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বললো, "ডাল দিয়ে সব ভাত মাখলে, শুখনো হয়ে গেল যে।" ও তাড়াতাড়ি আবার কয়েক হাতা ডাল এনে দিল।

ব্যস্ততার সঙ্গে বিদ্যুৎ বললো, "থাক, আর দিওনা, তোমার রইলো না বোধ হয়?" ও আলু-চচ্চড়ীগুলো সরিয়ে রেখে বললো, "আমি বড় অন্যমনস্ক হয়ে যাই, এদিকে আমার পেটে তো আর ভাত ধরেনা, তুমি এই চচ্চড়ীগুলো দিয়ে খেয়ে নিও।"

মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে লাবণ্য বললো, "আমার জন্তে অত ভাবতে

হবেনা, বাঙালীর ছেলে, তাদের সঙ্গে ডাকাডুকি তো অরুচিকর নয়, খেয়ে নাও ”

খুকির এতক্ষণে ঘুম ভেঙেছে। বিজ্ঞের মত বললো, “খেয়ে নাও বাপি, সেই কোন সকালে ভাত খেয়েছ, খিদে পায়না তোমার ?”

স্ত্রীর অনুযোগ। কন্যার শাসন। আলু-চচ্চড়ী না খেয়ে উপায় নেই। গাড়ীর সময় আসন্ন। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে লাল নীল কাঁচের বাতীটা ধরিয়ে বাইরে যেতে যেতে বললো, “এখনকার ডিউটি সেরে আমি ইস্কুলে চলে যাব। ফিরতে যদি দেরী হয় টু-টোয়েন্টি-ওয়ান আপ পাশ করিয়ে দিও।”

ওকে আশ্বাস দিয়ে লাবণ্য বললো, “গেট বন্ধ করব আর খুলবো, নীল বাতীটাও দেখিয়ে দিতে পারব।”

“আর শোন নীল কোট্‌টাও গায়ে চড়িয়ে নিও। ট্রেনের মধ্যে সাহেব-সুবো থাকতে পারে।”

ভাবতেও বিস্ময় বোধ করছিল বিদ্যুৎ, সংস্কারে জর্জরিত যে মেয়ের পায়ে পায়ে সঙ্কোচ আর কুণ্ঠা জড়ানো ছিল এতদিন, এ মানসিক মুক্তিতে কে তাকে আজ এমন করে উদ্বুদ্ধ করে তুললো ?

একটার পর একটা খান-দুই তিন মাল ও প্যাসেঞ্জার ট্রেন বের হয়ে যায়। এরপর বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন অবসর, তিন চার ঘণ্টা আর কোনও ট্রেন নেই। বড় মাঠখানা পার হয়ে ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ও নাইট-স্কুলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। ঝিকমিকে জোনাকী-জ্বালা পথ, কলা বাগানে ঘেরা একটা জীর্ণ চালা ঘরের মধ্যে বিদ্যুৎ এসে প্রবেশ করলো। এ ঘরখানা এখানকার একজন চাষীর ছিল, পঞ্চাশের মন্বন্তরে সর্বস্ব খুইয়ে সে যেন কোথায় উধাও হয়ে চলে গিয়েছে।

ঘরের মধ্যে কয়েকটা মাচাং বাঁধা হয়েছিল, তারই উপর পড়ানো

চলে। পাঠ্য-পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চেতনা-বোধের মধ্য দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক, ঐতিহাসিক ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

হঠাৎ একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করলো, "দাদা স্বাধীনতা মানে কী?"

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে থেকে বিদ্যুৎ বললো, "কাল থেকে আরও আধ ঘণ্টা বেশী সময় এ নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা হবে। আজকে শুধু এইটুকু স্বাধীনতার মর্মার্থ জেনে রাখ, দেশের প্রতিটি মানুষ দেশের সম্পদ স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে, সবল স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকবে, ভালো খাবে, ভালো পরবে। লেখাপড়া শিখতে পাবে, কর্মশক্তি এবং পরিশ্রমের উপযুক্ত মর্য্যাদা পাবে।"

এই সময় খানিকটা দূরে চৌকিদারের হাঁক শুনতে পাওয়া গেল। "জাগো, ভাই সব জাগো!"

এক মুহূর্ত ওরা কান পেতে শুনলো।

পুলিন বললো ফিস্‌ফিসিয়ে, "এই মহেশ সেদিনের মত কেউ বনে যা-না-রে। পালানোর আর পথ পাবে না।" বিদ্যুৎ ওদের নিষেধ করে বললো, "নারে, রোজ এক কারসাজিতে ধরা পড়ে যাবি।" বিদ্যুৎ তাড়াতাড়ি সংবাদপত্রগুলো সরিয়ে রেখে একখানি পাঠ্য-পুস্তক খুলে সামনে রাখে।

ততক্ষণে শুকনো কলা পাতায় মচ মচ শব্দ তুলে চৌকিদার স্কুলের সীমানা পার হয়ে আঙ্গিনায় ঢুকেছে।

বিদ্যুৎ উচ্চ কণ্ঠে পাঠ করছিল, "মহারাণী ভিক্টোররিয়ার নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ? তিনি ইংলণ্ডের রাণী ও ভারতের সাম্রাজ্ঞী ছিলেন। ভিক্টোরিয়ার দয়ার সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে। প্রজাগণ তাঁহাকে মাতার মত শ্রদ্ধা করিত তিনিও প্রজাবর্গকে পুত্রকন্যা

নির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া গিয়াছেন।"

ইতিমধ্যে চৌকিদার ঘরের দরজায় পৌঁছেছিল, মনোযোগ সহকারে পাঠের বিষয়বস্তু শুনছিল।

ওর দিকে তাকিয়ে বিদ্যুৎ থাম্‌লো। চৌকিদার হাসিমুখে হাতের চেঠোতে তামাক পাতা ঘষতে ঘষতে বল্‌লো, "বিদ্যুৎবাবু বহুৎ রাজভক্ত হইয়ে গিছে।" হাসিমুখে বিদ্যুৎ বললো, "বিদ্যুৎবাবু চিরদিন রাজভক্ত রে, সরকারী চাকরী করি যে।"

উৎসাহের সঙ্গে চৌকীদার বললো, "তাইতো! এমন ভালো ভালো পাঠ ছাত্তরদিগে দিবার পারছেন।"

"যার নুন খাই, তার গুণ গাইতে হয় তো।"

চৌকিদার বললো, "কাজ-কামের পর, চাষা-ভুষা মানুষরা লিখাপড়ি করতে পারছে, কত উন্নতি হয়ে যাবে। পুলিশে কনেস্টবল হতে পারবে, ডাকঘরে পিয়ন হতে পারবে।

সময় অনর্থক অপব্যয় হয়ে যাচ্ছিল, মহেশ চুপি চপি ওর হাতের মধ্যে কয়েকটা বিড়ি গুঁজে দিল। ও আবার উচ্চ কণ্ঠে ধ্বনি তুলে বোডের রাস্তার দিকে চলে গেল।

ওরা সকলে একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলো।

হাসি থামলে বিদ্যুৎ বললো, "দারোগা ব্যাটা ঘুঘুর বাচ্চা—, সেদিনকার আমাদের চাতুরী বুঝতে পেরেছিল। তাই চৌকিদার বদলে পাঠিয়েছে। ইত্যবসরে ভোরের ট্রেন গুম্‌-গুম্‌ শব্দে ষ্টেশনের দিকে বেরিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ বললো, "টু-টোয়েন্টি-ওয়ান আপ বের হয়ে গেল। আমার ডিউটিটা তো তোর বউদিই সারলো। মেলের সময় হোল, এবার যাই।"

ঘর থেকে নেমে দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলো বিদ্যুৎ।

উনিশ

কোহিনুরের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে মৈনাক পারলো না। সকাল থেকে গোপার প্রসব বেদনা সুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে সবিতৃ পৌঁছে গেছেন। হাসিমুখে বললেন, "ইটিজ গোইং নাইং মানথ্স। গোপা দেবীর 'নয়' মিঃ মজুমদার, আমি তো সেই ভাবে হস্‌পিট্যাল নার্সের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি।"

চিন্তিত মুখে মৈনাক বললো। "বোধ হয় আরলি ডেলিভারি হবে। নয় মাস ত যাচ্ছে, আপনি একটু কাইণ্ডলি পরীক্ষা করে দেখুন, ডাক্তার মৈত্র।"

"আপনি লালমনির হার্ট হস্‌পিট্যালে নার্সের জন্য টেলিফোন করুন।"

"আজকেই ভোর বেলা লোক পাঠিয়েছিলুম ডাক্তার মৈত্র। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মৈনাক বললো, "আগামী মাসের জন্য এ্যাপয়েন্ট করা হয়েছিল, এখন প্রত্যেকেই এন্‌গেজ্‌ড্, কারও আসা সম্ভব নয়।"

"ডোন্‌ট ম্যাটার।" ডাক্তার ওকে সাহস দিয়ে বললেন, "এক জন এ্যাসিটেন্ট পেলেই আমি সামলে নিতে পারব।"

ইতিমধ্যে গোপা ঘরে এসে উপস্থিত। আসন্ন মাতৃত্ব লাভের শ্রান্তিতে ওর পাণ্ডুর ম্লান চেহারা অত্যন্ত বিবর্ণ। শুষ্ক ঠোটের রেখায় একটা শীর্ণতা পরিস্ফুট। বললো, "ডাক্তার মৈত্র, আই এ্যম্ সো টায়ার্ড।" সবিতৃ মৃদু হেসে বললেন, "মা হওয়া কী সহজ কাজ গোপাদেবী। চলুন একবার পরীক্ষা করে দেখি কত দেরী।"

সবিতৃ ওকে পরীক্ষা করে মৈনাককে জানালেন, "ডেলিভারীর দেরী নেই, ফাষ্ট ষ্টেজ চলেছে, ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে হয়ে যাবে। আপনি একটু কাইগুলি কোহিনুরকে আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। ও আমাকে সাহায্য করতে পারবে।"

বিস্ময়ে থমকে গিয়ে মৈনাক বললো, "তিনি কি আসবেন ?"

"আসবে বৈকি মিঃ মজুমদার।" স্মিত মধুর হেসে সবিতৃ বললেন, "সেবাই তার জীবনের ধর্ম। তারপর আপনার আহ্বান সে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। আপনি তাকে শ্রদ্ধা করেন, সম্মান করেন। একজন নারীর আদর্শকে আপনি অনায়াসে ভেঙ্গে খান্ খান্ করে দিতে পারতেন, অবজ্ঞায় পদদলিত করতে পারতেন, পুরুষের স্পর্ধাবোধ নিয়ে তার স্বপ্নকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে পারতেন অনায়াসে। তা নয় তার আদর্শ আপনি সশ্রদ্ধে গ্রহণ করেছেন, তাই আপনার প্রতি সে অপরিসীম কৃতজ্ঞ। আপনাকে সে শ্রদ্ধা করে; ভালোবাসে, আপনার ডাকে আনন্দের সঙ্গেই সাড়া দেবে।"

মৈনাক একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। বললো, "আমিও তাঁর প্রতি কম কৃতজ্ঞ নই ডাক্তার মৈত্র। চাবুকের একটা তীব্র কষাঘাতে তিনি আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছেন। বিলাতকে আর বিলাতের বৈষম্যের নীতিকে অনুসরণ করতে করতে আমরা ক্রমশঃ নিজেকেই আঘাত হানছিলুম। কোহিনুর আমার চেতনা ফিরিয়েছেন। আমিও তাঁকে কম শ্রদ্ধা করি না, কম ভালোবাসি না।"

তেমনি হাসি ভরা মুখেই সবিতৃ বললেন, "ঘুম আপনার ভেঙেছে—কিন্তু তন্দ্রার ঘোর আপনার এখনো কাটেনি মিঃ মজুমদার। কোহিনুর দাসত্বের বন্ধনকে আন্তরিক ঘৃণা করে।"

মৈনাক বললো, "আমিও আর গোলামী সহ্য করতে পারছিনে।"

সবিতৃ বললেন, "দেশকে ভালোবেসে কত সাধক, কত সেবক, কত বীর কত ত্যাগ স্বীকার করলেন, কত দুঃখ স্বেচ্ছায় বরণ করলেন। সেই মাপকাঠিতে বিচার করলে দাসত্ব বর্জন নিতান্তই তুচ্ছ কথা। এ কথাও সত্যি যে পরাধীন দেশে বাস করার অর্থ-ই পরের দাসত্ব করা। তবু পার্থক্য এই চাকরীজিবীদের উপর যে অকারণ জুলুম চলে, অহেতুক প্রভুত্বের দাবী, অত্যাচার, লাঞ্ছনা হয় স্বাধীন জীবিদের উপর তা নিষ্ফল আত্মপ্রকাশের মধ্যেই রূপান্তরিত হয়ে যায়। চাকরী জীবিরা ওদের ঘরের পোষা বেড়াল কিনা!"

গোপা সবিতৃ ও অগ্রজের কথাবার্তা শুনছিল। ইতিমধ্যে আবার মাতৃত্বের তাগিদে বেদনায় ও চঞ্চল হয়ে উঠলো। ওষ্ঠ প্রান্তের শীর্ণতা আরও ক্লিষ্ট হয়ে এল, সারা মুখ দৈহিক যন্ত্রনার ছাপে কালো হয়ে উঠলো। ওর গর্ভস্থ নতুন মানুষটী পৃথিবীতে পদার্পনের ব্যাকুলতায় যে কী উদগ্র উন্মুখ হয়ে উঠেছে, গোপার বেদনা কম্পিত চোখ দুটী তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। পুরাতন মাটীতে বার বার জন্মলাভ তবু নতুন স্পর্শের বুঝি নতুন অনুভূতি।

ওর বেদনা ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে সবিতৃ বললেন, "পায়চারী করে বেড়ান, ফ্রী ডেলিভারী হবে।"

আবার মাতৃত্বের বেদনা গোপার উপশম হয়ে এল। অগ্রজের উদ্দেশে একটু কৌতুক প্রকাশ করে সে বললো—"তুমি গেলে কোহিনুরদেবী নিশ্চয়ই আসবেন দাদা।"

মৈনাক আর দাঁড়ায়নি। সিঁড়ি দিয়ে মাঠে নেমে পড়লো। নিজেই সে কোহিনুরকে নিয়ে আসবে।

মৈনাক আরও এগিয়ে ট্রলিতে গিয়ে বস্‌লো।

কুড়ি

আজ ভাঙ্গনেরই মহোৎসব। ইতিমধ্যে অনেক মানুষ পাত্তাড়ি গুটিয়েছে।

বস্তি ভাঙ্গতে সুরু করেছে, কঞ্চির বেড়া খুলে যাচ্ছে, ঘরের চাল রাতারাতি উধাও হচ্ছে, মাটীর দাওয়া ধ্বসে পড়ছে।

কয়েকদিন আগে সবিতৃ বাবার একখানা চিঠি পেয়েছেল। তিনি লিখেছেন, খোকা, অনেকদিন থেকেই জীবনটার মধ্যে একটা যেন ভঙ্গুরতা অনুভব করছি। দেহটা যেন ক্রমশঃ পঙ্গু আর শিথিল হয়ে আসছে। আমি আর বেশীদিন বাঁচবো না রে, আয়ু যে ফুরিয়ে অসেছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি এরই নাম বুঝি জরা। পেটের সেই ব্যথাটা আবার বেড়েছে, কবিরাজ হাল ছেড়ে দিয়েছে।

আজ অনুভব করছি—তোর মাকে হারিয়ে আবার দার পরিগ্রহ করে কত না ভুল করেছি। নিজেও সুখী হতে পারলুম না, তোকেও সুখী করতে পারিনি। তোর মার আসনকে নীচে নামিয়ে দিয়েছি বলে অভিমানে তুই আজ ঘর ছাড়া। সত্যি করে বল্‌তো খোকা আজ যদি তোর মা বেঁচে থাকতেন, তাঁর স্নেহের ডাককে তুই কী প্রত্যাখ্যান করতে পারতিস? না এমনই করে বৈরাগ্যকেই জীবনের মন্ত্র বলে গ্রহণ করতিস? ছিঃ ছিঃ কী অন্যায় করেছি; সন্তান জন্মগ্রহণের পর মানুষ যেন দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে।

আমার উপর আর অভিমান করে থাকিস্‌নে খোকা। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। একবার বাড়ী

আসিস। তোকে না দেখলে আমি শান্তিতে মরতে পারবো না।

সবিতৃ জানালার বাইরে ভাঙ্গা বস্তির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অফিসে কয়েকদিন আগে ছুটীর দরখাস্ত করেছিলেন, হয়তো তারই উত্তরের অপেক্ষা করছিলেন। আর কিছুক্ষণ পরেই অফিসের ডাক নিয়ে ট্রেন এসে পৌঁছুবে। বাবা আরও লিখেছেন, খোকা মধ্যে মধ্যে যে বাঁচবার সখ হয়না, তা নয়। একটী মেয়ের অকাল বৈধব্যর কথা স্মরণ করে বাঁচতে ইচ্ছে করে বৈকি। তাকে আমি সুখী করতে না পারলেও, তার নোয়া আর শাঁখা সিঁদুরের গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে পারি তো? যার ফলে অন্তরে সুখী না হলেও জীবনে স্বচ্ছন্দ টুকু ভোগ করতে পারবে। শুনতে পাই দাশু সান্যালের তৃতীয় পক্ষের বউ নাকি বিধবা হয়ে আতপ চালের ভাত গিলতেই পারেনা।

তারপর ভাবি বেঁচে থেকেই বা কোত্থেকে সিদ্ধ চালের ভাত স্ত্রী পুত্রের মুখে তুলে দেব? যুদ্ধ মিটে গেল। কিন্তু দেশ জোড়া দারিদ্র্য আর দৈন্য মিটলো না। আরও কতদিন যে এমনই সংগ্রাম করব তাও জানিনা। যুদ্ধের সময় তোকে যে বেশী টাকা দিত তা ওরা তুলে নিল। কিন্তু জিনিষ পত্রের দাম হু-হু করে বেড়ে চলেছে। তারপর কাপড় সমস্যা কী ভয়াবহই না হয়ে উঠেছে। বাড়ীতে পাঁচজন মানুষ—একখানা কাপড়। ললিত ভট্টাচার্যের বউ লজ্জা নিবারণ না করতে পেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কালো বাজারে কাপড় কিনতে চরম অবস্থায় পৌঁছেচি, তোকে আর কত বিরক্ত করি? তুইতো নিজের কথা ভাবলি না, সংসারকে বাঁচিয়ে রাখতে দাসত্ব করিস্। তোর মাইনেটাতো আমারই সম্পত্তি হয়েছে।

যুদ্ধ কী সত্যি থামলো রে খোকা? কিন্তু দেশের অবস্থা যে

বড়ই শোচনীয়, গ্রাম ছেড়ে যারা দলে দলে যুদ্ধের কাজে গেছলো, আজ তারা ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে আসছে কিন্তু দেশে খাবার কই? কাপড় কই?

বাবা আরও লিখেছেন রুনু-মার বর পাওয়া গেল না। কী ইচ্ছে করে ওরা বর খুঁজলো না, তা ঠিক বুঝতে পারা গেল না।

"দাদা,"

সবিতৃ দৃষ্টি ফিরিয়ে বিদ্যুতের দিকে তাকালেন।

বিদ্যুৎ তার হাতে বড় খামে বন্ধ একটা চিঠি দিয়ে বল্‌লো, "ষ্টশনে গেছলুম, আপনার এই চিঠিখানা ছিল। মাষ্টার মশাই পাঠিয়ে দিলেন। অফিসের ডাক। ত্রস্ত হাতে সবিতৃ খুলে ফেল্‌লেন। ছুটির দরখাস্তের উত্তর এসেছে। ছুটী মঞ্জুর হয় নি।

ডিস্‌পেন্‌সারী থেকে বেরিয়ে মাঠে নেমে সবিতৃ বল্‌লেন, "বাবার অসুখ, বৃদ্ধ হয়েছেন হয়তো বাঁচবেন না। কয়েকদিন ছুটী চেয়েছিলুম—"

"দিলনা বুঝি।" ব্যথিত ভাবে বিদ্যুৎ বললো, "কী বল্‌লো? লিখেচে বুঝি—রিলিফ নেই।"

সবিতৃ বল্‌লে, "হ্যাঁ ওই বাঁধা গতের বুলি।" রিগ্রেট, নো রিলিফ।

"রিলিফ যদি না থাকে ক্যাজুয়াল লিভ, এল এ পি এসব রাখার কী দরকার।"

শান্ত কণ্ঠে সবিতৃ বল্‌লে, "তুমি অফিসারকে ঠিক দায়ী করতে পারনা বিদ্যুৎ। একেই বলে বোধহয় এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর ডিসিপ্লিন।"

সমস্যা জটিল। বিদ্যুৎ নিরুত্তর।

এবার ওঁরা শ্রমিক বস্তির সামনে দিয়ে হাঁটছিলেন। একটা দাওয়ার প্রান্তে চৈতন্য ম্রিয়মান মুখে বসেছিল। চৈতন্যর থাইসিস

হয়েছে…, অফিসে জানাজানি না করে ওকে মাস দুই বিশ্রামের জন্তে ছুটি দেওয়া হয়েছিল। বিস্ময়ের প্রগল্‌ভে ওর সামনে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লেন সবিতৃ ডাক্তার। "চৈতন তুই কবে ফিরলি ? কেমন আছিস ?"

দুই হাতে বুক চেপে ধরে চৈতন্য কাশতে সুরু করলো। দম নিয়ে বল্‌লো, "দুই মাস ছুটী তো ফুরিয়ে এল বাবু। বেতন ছাড়া ছুটী—ঘরে বসে তো আর দিন কাটেনা। ফিরে এলাম, কিন্তু বাবু কাজ করবার শক্তি আমার একেবারেই ফুরিয়ে গেছে।"

আবার কাশলো চৈতন্য। এবার খানিকটা রক্ত উঠে এল।

সবিতৃ বল্‌লেন, "চাকরী যাক্‌গে চৈতন, তোমাকে আমি হাসপাতালে যদি ভর্তি করতে পারি চেষ্টা করি। মজুমদার সাহেবকে ধরে তোমার কাজটা এমন কোনও আত্মীয়কে দাও যে তোমার পরিবারকে কিছু অন্ততঃ সাহায্য করতে পারবে।"

"দরকার নেই বাবু, কেরাণী বাবুর ভাগ্নেই নিক চাকরীটা—, ওদের দীর্ঘ নিশ্বাসে কী আর আমার ভালো হবে বাবু। আবার কাশীর ধমক উঠলো।

ডাক্তার কী আর বলবেন ? বিদ্যুৎও নির্বাক। আবার হাঁট্‌তে লাগলেন। লাইনের অপর প্রান্তে সবিতৃর কোয়াটার—জংসন ষ্টেশনের শাখায় শাখায় বিভক্ত অগণিত লাইন। অন্যমনস্ক ভাবে লাইনগুলি পার হতে লাগলেন। "যাদবপুরে একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে চৈতন্যর জন্তে। অবশ্য যত রোগী, তত বেড নেই। তবু একবার চেষ্টা—"

আন্মনা বিদ্যুৎ সোজা এগিয়ে যেতে লাগলো। বুকের মধ্যে কিসের একটা ঝড় উঠেছে। চৈতন্যকে বিভীষিকা মৃত্যুর কবল থেকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে হবে।—রক্ষা করতেই হবে।"

একুশ

সহজ ভাবেই গোপার একটী ছেলে হয়েছে। যথাসময়ে কোহিনুর এসে পৌঁছেছিল, সবিতৃকে আনুসঙ্গিক সাহায্য করেছিল। কিছুক্ষণ আগে সবিতৃ প্রসূতির ব্যবস্থা পত্র লিখে দিয়ে চলে গেছেন।

পরিশ্রান্ত গোপা ঘুমিয়ে পড়েছে, ফুটফুটে সুন্দর নবজাতকটী অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বিছানার পাশে দু-খানা চেয়ার পাতা। একখানাতে কোহিনুর বসে পলকহারা চোখে সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর মুখেরদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

মৈনাক প্রসূতি ও শিশুকে দেখতে ঘরে এসে ঢুকলো। কোহিনুর মৃদু গলায় বললো, "গোপাদেবী ঘুমুচ্ছেন।"

আর একখানা চেয়ারে বসে পড়ে মৈনাক শিশুটীর নরম তুলতুলে আঙ্গুলগুলো নিজের হাতে অনুভব করতে লাগলো।

কোহিনুর একটু ঝুঁকে বলে উঠলো, "কী করছেন মৈনাকবাবু, বাচ্চার ঘুম ভেঙ্গে যাবে—"

"ঘুম ভাঙ্গুক না—আর কত ঘুমুবে।" মৃদু হাসলো মৈনাক— "মাতৃজঠরে দীর্ঘদিন ঘুমিয়েই তো কাটালো।'' এবার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে মৈনাক বললো, "কি সুন্দর দেখতে হয়েছে, না?" "ভারী সুন্দর", ওরা দুজনে একসঙ্গে ঝুঁকে শিশুটাকে দেখতে লাগলো। কোহিনুর বললো, "রক্ত মাংসের একটী ড্যালা ছাড়া আর কিছু নয়। তবু শিশু কত সুন্দর! এ সৌন্দর্যের বুঝি কোথাও তুলনা নেই।"

কাঁথা ভিজিয়ে শিশু এবার কেঁদে উঠলো। গোপা চোখ মেলে

তাকালো মৃদু হেসে বললো, "ঘুমের ভান করে তোমাদের সব কথা বার্তা আমি শুনেছি দাদা।" আবার খিলখিল করে হাসলো গোপা।

উঠে দাঁড়িয়ে মৈনাক বল্লো, "অত হাসি কেন? ছেলে হয়েছে বলে খুশির যে সীমা নেই। সুন্দর ছেলে হয়েছে, সাবধানে থাকবি, আমি কাল রাত্রেই তোর বরকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, কোহিনুরদেবী দিন তিনেক তোর কাছে থাকবে।

"মোটে তিনদিন, না দাদা আরও বেশীদিন।" অগ্রজের দিকে গোপা সুমিষ্ট একটি কটাক্ষ হান্লো। হাসি মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে মৈনাক বললো, "রাখতে পারিস যদি তুই তাঁকে রাখিস্।"

গোপা বললো, "ভাগ্যে খোকার জন্ম হোল তাই আপনার সঙ্গে আলাপের সুযোগ পেলাম।"

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কোহিনুর বললো, "আপনার কথা ডাক্তার কাকার কাছে শুনেছি। আলাপ হয়ে গেল, খোকাকে দেখতে মধ্যে মধ্যে আসতে হবে।"

"বাঃ শুধু বুঝি খোকাকে দেখতেই আসবে, দাদাকে দেখতে বুঝি একটুও ইচ্ছে করেনা। আমি জানি দাদা তোমাকে ভালোবাসে।"

সলজ্জ হেসে কোহিনুর বললো, "আমারও ভালো লাগে ওঁকে গোপা। তবে—"

ঠিক এই সময় মৈনাক অফিসের পোষাক পরে ঘরে এসে ঢুকল। স্নিগ্ধ হাসিতে ওর প্রফুল্ল মুখ উদ্ভাসিত। গোপা বললো, "ও! দাদা সরকারের দাস বলে ওকে বুঝি তোমার বিশ্বাস হচ্ছেনা? এবার গোপা অগ্রজের দিকে একটু সুমিষ্ট কটাক্ষ হেনে বললো, "দাদা, ফেলে দাও তোমার ওই দাসত্বের মিথ্যে আভিজাত্য।" গোপার প্রগলভতা থামিয়ে দিয়ে মৈনাক বললো, "শোন্ গোপা, পাঞ্জাব

থেকে আমার এক বন্ধু বাংলার গরুর দুরবস্থার কথা শুনে মূলতানের গরু পাঠাচ্ছে। তুই বাচ্চার দুধের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলি তাই তোকে খবরটা দিয়ে গেলুম।"

গোপার চোখদুটি কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, "আমি তো ইতি মধ্যেই টিনের দুধ আনিয়ে ফেলেছিলুম কতকগুলো।"

মৈনাক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে কোহিনুর বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, "তুমি বাচ্চাকে বুকের দুধ দেবেনা ভাই।"

"বুকের দুধ?" গোপা বললো, "না-ভাই আমাদের পরিবারে ছেলেকে বুকের দুধ খাওয়ানোর রীতি নেই। মামীমা, বউদিরা বলেন, ছেলে বুকের দুধ টানতে সুরু করলে ফুরোয়না। মায়ের স্বাস্থ্য হানি ঘটে। আমার কাছে ব্রেষ্ট পাম্প আছে। কয়েকদিন পরেই দুধ ফেলে দিতে হবে।"

"আমার মা কী বলেন জানো। কোহিনুর বললো, "শিশুর জন্যেই তো মায়ের বুকে অমৃত সুধা উপচে ওঠে। শিশুকে বঞ্চিত করার মধ্যে মায়ের স্বাস্থ্য হানি যুক্তির চেয়ে তাদের দেহশ্রীর ছন্দ পতনের শঙ্কাটাই প্রধান কিন্তু এতে মাতৃত্বর সৌন্দর্য্যকে শুধু নোংরা করে না বীভৎস করে তোলে।"

গোপা এ কথার কোনও উত্তর দিলনা। কোহিনুর আবার বললো…"এ সব ঠুনকো ম্যারিস্টোক্রেসির মধ্যে রঙিন কাঁচের ঝকমকানি ছাড়া আর কিছু নেই তুমি জেনো।"

এই সময় বেয়ারা একটি টেলিগ্রাম দিয়ে গেল। গোপার স্বামী জানিয়েছে, নতুন শিশুর খবর পেয়ে আনন্দিত, কয়েকদিনের মধ্যে সে আসছে। ওরা দুজনে এক সঙ্গে টেলিগ্রামটা পড়ে নিল। কোহিনুর হাসিমুখে বললো, "এইবার তুমি তো বরের সঙ্গে ফিরে যাবে, কী বলো?"

"তুমি দাদার ভার না নিলে আমি যাই কী করে ?"

এমনি আনন্দ কৌতুকের মধ্যে দিয়ে কয়েকটি দিন পার হয়ে গেল। সবিতৃ প্রত্যহ আসেন, প্রসূতি ও শিশুকে পরিদর্শন করেন, কোহিনুরের শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যার অফুরন্ত প্রশংসা করেন।

সেদিন কোহিনুর ফিরে যাবে। গোপা ওকে অশ্রু-সজল চোখে বিদায় দিয়ে বললো, "তোমার সেবা, স্নেহ, যত্ন চিরদিন মনে থাকবে। আশায় পথ চেয়ে রইলুম, দাদাকে তুমি মানুষ করে তুলবে।"

বারান্দা পার হয়ে মৈনাক আর কোহিনুর সিঁড়ি দিয়ে বাগানে নাম্‌লো। গেটের বাইরে লাইনে ট্রলি দাঁড়িয়ে ছিল। মৈনাক কোহিনুরকে বাড়ী পৌঁছে দেবে।

মাধবীলতার কুঞ্জে ওরা দুজনে দাঁড়াল কিছুক্ষণ।

কোহিনুর আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে বলোল, "এবার তবে যাই।"

এমন ভাবে বলোল কথাটা যেন অনুমতি চাইছে ও মৈনাকের কাছে। যেন মৈনাকের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর কোহিনুরের যাওয়া না যাওয়া নির্ভর করছে।

ধরাগলায় মৈনাক বলোল, "ধরে তো আর রাখতে পারব না।"

কোহিনুর-এর সারা শরীর রোমাঞ্চে কেঁপে উঠল।

একটী মাধবীলতা তুলে সে মৈনাকের বাটন্ হোলে পরিয়ে দিল। মৈনাক ওকে একান্ত কাছে টেনে নিয়ে সস্নেহে একটি চুম্বন এঁকে দিল।

বাইশ

আরও কতদিন ?

বিদ্যুৎ বুঝে উঠতে পারেনা আরও কতদিন দাসত্বের বোঝা ওকে সইতে হবে ?

কোন ভরসায় চাকরীতে ইস্তফা দেবে বিদ্যুৎ। র‍্যাশানের উপর নির্ভর না করে চলেনা। এ-ছাড়া মাথা গোঁজবার খুপরি টুকু রয়েছে।

এইমাত্র বিদ্যুৎ হেড অফিস থেকে একখানা সরকারী চিঠি পেয়েছে। মনোযোগ সহকারে সে চিঠিখানা পড়ল।

লাবণ্য উদ্বেগ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলো, "কী খবর—বদলি করলো বোধহয় ?" "না লাবু এবার আর বদ্‌লি নয়," বিদ্যুৎ বললো, "বুঝি একেবারেই—" লাবণ্য কিছু বুঝে উঠতে না পেরে প্রশ্নোত্থিত চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল। বিদ্যুৎ বললো, "তোমাকে সেদিন হাট থেকে ফিরে বলেছিলুম। হাটে জামা কাপড় বেচতে নন্দী শাসিয়েছে। শুধু শাসিয়ে সে ক্ষান্ত হয়নি, অফিসে জানিয়ে দিয়েছে।

বিস্ময়ের আতিশয্যে লাবণ্য স্তব্ধ হয়ে গেছলো। বিদ্যুৎ বলতে লাগলো অফিস থেকে চিঠি দিয়েছে তুমি তোমার চাকুরীর কর্তব্যের প্রতি অবহেলা কর এবং অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জন কর। এর কৈফিয়ৎ আমরা চাই, যদি সদুত্তর না দিতে পারো, তোমাকে সাস্‌পেণ্ড করা হবে।

সাস্‌পেণ্ড! উত্তেজিত হয়েছিল লাবণ্য। উত্তপ্ত কণ্ঠে বললো, "এখুনি তুমি চাকরী ছেড়ে দাও। এত অপমান আর অসম্মান

বরদাস্ত করা যায়না। কয়েক মুহূর্ত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বিদ্যুৎ বললো, "দারিদ্র্যের যে তুমুল ঝড় নেমে আসবে, সহ্য করতে পারবে তো লাবু।"

লাবণ্য বললো, "মৃণা মাসীর অ.শ্রমে আমাদের একটাকিছু সংস্থান করা যাবে।"

একটুক্ষণের জন্ত কি যেন ভাবল বিদ্যুৎ তারপর বলল।

"তাহলে দাও তো কাগজ কলম। রেজিগ্‌নেশন চিঠিটা লিখেই ফেলি। আজই অফিসে পাঠিয়ে দব।"

নিস্তেজ পড়ন্ত রোদে তাপ নেই, শী:তর রোদে আছে একটা রুক্ষ বিবর্নতা। মাঠে ঘাস নেই, খাল বিল ডোবায় জল নেই। হাড় বের করা শীর্ণ অ:নকগুলি গরুর দলে ওই শুষ্ক ঘাস শূণ্য মা:ঠ আসন্ন প্রনবা জাবাও বিচরণ করছিল। প্রসবের দিন প্রায় আগত তাই ও:কে আর এখন লাবণ্য দড়িত্ব দেয়না। তবে ওর আশঙ্কার অন্ত নেই, কে জানে কখন বেললাইনের তলায় ও নি:স্পেনিত হয়ে যায়। এই তো সেদিন কান্ত দরজিব বকন বাছুরটা কাটা গিয়েছে।

বিদ্যুৎ:তর দরখাস্ত লেখা শেষ হয়েছিল, লাবণ্য বললো, "তোমার টু-:টায়েন্টির ডাউন হয়েছে ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে একটু জবাকে দেখো ও যেন কাটা না পড়ে।" ত্র:স্ত উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ বললো, "এ গাড়ীর কাজ একজন খালাসী চালিয়ে দেবে, টু-টোয়েন্টি:তে সাহেবের মুলতান থেকে গরু আস:ছ, আমাকে নামাতে হবে।" "সাহেব একা মানুষ মুলতানের গরু কী করবে? "বিস্ময় প্রকাশ করে লাবণ্য জিজ্ঞেস করলো "

"সাহেবের বোনের ছেলে হয়েছে জানোনা।"

"জানি বৈকি," একটু ইতস্ততঃ করে লাবু বললো।

"তারা বড় লোক—তাদের বুকেও কী দুধ নেই? ছেলেকে মাই দেবেনা।"

"তুমি বড় বোকা মেয়ে, মেমসাহেব মায়েরা ছেলেদের মাই খাওয়ায় না, জানোনা?"

দূরে গাড়ীর শব্দ শুনতে পাওয়া গেল, ত্রস্ত পায়ে বিদ্যুৎ বাইরে বেরিয়ে গেল। বিস্ময়ের ঘোরটা আয়ত্ত করে নিতে খানিকটে সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল লাবণ্যর। ও নিজের শূণ্য বুকে স্তনের রিক্ততার বেদনা গভীর স্নায়ুতে স্নায়ুতে অনুভব করছিল। নিংড়েও এক ফোঁটা দুধ যে খুকিকে দিতে পারেনি।

হঠাৎ একটি হৃদয় বিদারক চীৎকারে ও চমকে উঠলো। "আহা—আহা—গাভীন গরুটা কাটা পড়লো!"

কম্পিত হৃদয়ে বাইরে এল লাবণ্য। ওর কেঁদে ওঠা বুঝি মিথ্যে হয়নি। ট্রেনখানা ততক্ষণে ষ্টেশন প্রান্তে পৌঁছে গেছে। আসন্ন প্রসবা জবা লোলুপ হয়ে দুই লাইনের মধ্যেকার ঘাস খেতে ছুটে গেছলো। ইতি মধ্যে···

নির্বাক দৃষ্টিতে লাবণ্য দ্বিখণ্ডিত জবার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর গর্ভস্থ বাছুরটি অনেক দূরে ছিটকে গিয়েছে। বাংলা দেশের হাড় বেরকরা শীর্ণা জননী। মুলতানের সুপুষ্ট সাদা রঙের মস্ত সন্তান গর্ভে ধরেছিল। লিন্‌লিথগোর অনুকম্পার তুলনা হয়না। আরও কতক্ষণ চলৎশক্তিহীন লাবণ্য এমনই বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে কে জানে! ততক্ষণে চামড়া লোলুপ মুচি বকবকে ছুরী হাতে উপস্থিত হয়েছে। মেথর বস্তির ছেলে মেয়েরা ভাঙ্গা কলাইর পাত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে লাবণ্য ভেতরে চলে এল।

খুকিকে পরম আদরে কোলে তুলে নিল। খুকি ওর অভ্যাস মত জননীর কোলে মাথা রেখে গান গাইতে লাগল। "ভবা গাই বাছুর দেবে, বালতি বালতি দুধ হবে।"

মৈনাকের বাঙলোতে তখন মুলতানী গরুর বালতি বালতি দুধ দুয়ে ফেলতে বাঙালী গয়লা হিম্‌সিম খেয়ে গেছলো। গোপার স্তন ছাঁকা দুধ নিয়ে মেথরাণীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে। পরেশ ময়রার দোকানে ঠিকেদাররা গোগ্রাসে ছানার মিষ্টান্ন খেয়ে চলেছে।

লাবণ্য একদৃষ্টে যেন কোন্‌দিকে তাকিয়েছিল। উঠোনে কয়েকটী কাক ঠোঁট দিয়ে জবার ভুষি ভর্তি টিনটি উলটিয়ে ফেলে দিল।

তেইশ

পিতৃশ্রাদ্ধাদি শেষ করে আবার কর্মস্থলে ফিরে এলেন সবিতৃ। সবিতৃর বাবার মৃত্যুর দিন ছয়েক পরে ছুটি মঞ্জুর হয়ে এসেছিল। অবশ্য দুঃসংবাদ পেয়েই আবার তাঁকে জরুরী তার দিতে হয়েছিল। জবাবী তারের উত্তর আসেনি। দুদিন পরে ডাকে ছুটী মঞ্জুর করা হয়েছিল। পত্রে জেনেছিলেন সবিতৃ, তার তারের পয়সা অফিসে জমা রইল, প্রয়োজন মত খরচ করা চলবে।

ফাল্গুনের সুরু। বসন্তের মহোৎসবের রং লেগেছে। প্রাণ প্রাচুর্যের সমারোহের অন্ত নেই। রুক্ষ বিবর্ণ শীতের পর মাঠ বন তরু বীথি ফুলে অপরূপ হয়ে উঠেছে। নতন ফুল, আমের কুঞ্জে কুঞ্জে নতুন মুকুলের সম্ভার, বাতাসে তারই সুরভি।

প্রকৃতির বসন্তের মাতনের সঙ্গে সঙ্গে দেবীবসন্তের মাহাত্ম্য বিস্তার লাভ করলো। দেখতে দেখতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শীতলা মায়ের করুণা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

সবিতৃ এবং বোর্ডের ডাক্তারের সতর্কতার অন্ত নেই। দফায় দফায় টিকে দেওয়া, প্রতিষেধকের নানা উদ্যম আর আয়োজন।

এরপর শীতলা জননীর পূজা অর্চনার মহাধুম। রাঙা সিঁদুর মাখানো মিশমিশে কালো রঙের পাথরের নুড়ি, কয়েকটী সাদা গুটীও গায়ে রয়েছে, অশ্বত্থ আর বটবৃক্ষের ছায়া প্রাঙ্গনে জাঁক জমকের সঙ্গে দেবীর আরাধনা চলতে লাগলো। অষ্ট প্রহর হরিসংকীর্ত্তনের বিরাম নেই। এ-ছাড়া রয়েছে নানা টুকি টাকি ওষুধপত্র কবচ ইত্যাদি।

বিভীষিকাময়ী দেবীর তাণ্ডব লীলাকে অগ্রাহ্য করবার সাধ্য কার ? দেখতে দেখতে গ্রামাঞ্চল এক ভয়াবহ বীভৎস মূর্তি ধারণ করলো।

সবিতৃ তখন একটী বছর ছয়েকের ছেলেকে দেখে তাঁর পরিচিত রহিম আতুল্লার কুটীরের পেছন দিক দিয়ে ফিরছিলেন। নতুন কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা রহিম আতুল্লার বাগানে লিচুগাছ কয়েকটী বড় হয়েছে, এবার নতুন লিচু ধরবে, সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সাদা ফুলে ভরে গিয়েছে। রহিমআতুল্লা একদিন সবিতৃকে বলেছিল, "ডাক্তারবাবু আপনার পাওনা মর্য্যাদা আমরা কোনদিন দিতে পারিনা, খোদা আপনার মঙ্গল করুন। আমার লিচু গাছে প্রথম ফল ধরলে আপনার বাসায় পৌঁছে দেব।" একটা নিঃশ্বাস ফেলে সবিতৃ ভাবলেন, রহিম আতুল্লার লিচু গাছে নতুন মুকুল ধরেছে, কিন্তু রহিমআতুল্লা কোথায় ? মহামারীর হাত থেকে সেও নিষ্কৃতি লাভ করেনি। ওর তৃতীয়-বারের স্ত্রী আমিনা খাতুন ওই লিচুগাছের তলায় নিজ হাতে স্বামীর কবর রচনা করেছিল। ওই কবর প্রাঙ্গনে লিচু ফুল আর কয়েকটা শুকনো পাতা ঝরে পড়ে রয়েছে। বাড়ীর ভেতরে একটা চাপা কান্নার অব্যক্ত ধ্বনি গুমরে গুমরে ফিরছে। সবিতৃ জানেন এ কান্না আমিনার। কে জানে আরও কতদিন সে এমনই আর্তনাদ করে কাঁদবে।

খানিকটা দূরে তিস্তা নদীর চর দেখতে পাওয়া যায়। চরের কয়েকজন বাসিন্দে ডেকেছে। রোগ ভালো করবার তাঁর কোনও ক্ষমতা নেই, তবু মানুষের আশা আর বিশ্বাস। ডাক্তার ওদের কাছে হার মেনে যান। নদীর প্রান্তে হাঁটতে হাঁটতে সবিতৃ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একটু ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে একটী উলঙ্গ স্ত্রী-লোকের মৃতদেহ। সাদা গুটীগুলো তখনও তার সর্বাঙ্গে স্পষ্ট

পরিব্যপ্ত। তার একখানা পা ইতিমধ্যে শৃগালে সাবাড় করে ফেলেছে। খানিকটা দূরে তাল বনের শীর্ষদেশে শকুনেরা জটলা করেছে।

নৌকা নোঙর করা ছিল তীরে। মাঝি বললো, "কত পাপ ছিল বাবু, মড়া আর কেউ পোড়ায় না, ফেলে পালাতে পারলেই বাঁচে। ঘোলাটে নদীর জল পচা গন্ধে ভেপসে উঠেছে।"

"পাপ ছাড়া আর কী ভাই;" সবিতৃ বললেন, "যুদ্ধ মিটে গেল, তবু মানুষের অন্ন বস্ত্র সমস্যার সমাধান হোলনা। না খেতে পেয়ে পেয়ে মানুষের জীবনী শক্তি ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। জীর্ণ স্বাস্থ্য বুকের মধ্যে ফোঁপড়া, মাথার মধ্যে ঝাঁঝরা। অবসন্ন মন পঙ্গু।

মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই না সংক্রামক ব্যাধি এমনই আধিপাত্য বিস্তার করতে পারলো। মাঝির জীবনে দুঃখ ও ব্যর্থতার অন্ত নেই। মরা নদীতে উজান বাইতে বাইতে সে ডাক্তারবাবুকে শোনাতে লাগলো তার জীবনে একটি কাহিনী। ওর নৌকা ছিল তিনখানা। শত্রুপক্ষের আতঙ্কে একে একে মিলিটারীরা দখল করে নিল। সুতো পেলোনা, জাল পেলোনা লোকাল টেণগুলো চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে এল, দেখতে দেখতে মাছের ব্যবস্থা একেবারে ডুবে গেল।

চরে নৌকা নোঙর করলো। একটা লোক এগিয়ে এসে সবিতৃকে নামিয়ে নিয়ে গেল! কুটীর-প্রত্যন্তে মেটে দাওয়ায় একটি দশ বারো বৎসরের ছেলে ছটফট করছে। চোখ ওর টকটকে লাল, মেরুদণ্ডে অসহ্য যন্ত্রনা, কণ্ঠনালীতে বেদনা। সবিতৃ সম্পূর্ণ নিরুপায়। বসন্তর সমস্ত লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করেছে। নিজের ক্ষমতার দৈন্যে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করলেন। কয়েকটি মামুলি ওষুধ পত্র দিয়ে বললেন, "গুটিগুলো বেরিয়ে গেলেই যন্ত্রনাটা কমে আসবে।"

লাবণ্যকে আর চেনবার উপায় নেই। একমাত্র সন্তান পচু প্রায় ভালো হয়ে এসেছিল, তাকে হারিয়ে সে নিজে ভালো হয়ে উঠেছে। লিকলিকে সরু পাট কাঠির মত চেহারা, হাড় বের করা শীর্ণ মুখে বসন্তের ভয়াবহ চিহ্ন আঁকা। তখনও সে শয্যাশায়ী নড়তে চড়তে পারেনা। মানসিক অবসাদে যেন পাথরের মত নিশ্চল নির্বাক।

বিদ্যুৎ ডিউটি থেকে ফিরে বললো, "দুধটা খাওনি লাবু, পড়ে রয়েছে যে।

লাবণ্য স্বামীর প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলনা। বেদনা ব্যথিত চোখ দুটি মেলে নিঃশব্দে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, কী যেন সে বলতে চায়, মূক হয়ে আসে ওর অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

বিদ্যুৎ বললো, "দুধটা তোমায় গরম করে দি। একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

এবার লাবণ্য আর নিজেকে সংযত করতে পারলোনা। বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মত অশ্রু সায়রে ও যেন উছলে উঠলো, কান্নার আবেগটা কমে এলে ও বললো, "লক্ষ্মী, ওই 'দুধ' কথাটা আর আমার কাছে কোনওদিন উচ্চারণ কোরনা।"

বিদ্যুৎ ওর কাছেই বসে রইল।

ভাঙ্গা গলায় লাবণ্য বললো, "যখন জ্ঞান ছিলনা, তোমরা কী করেছ জানিনা। এর তো আর প্রতিবিধান নেই।"

বিদ্যুৎ বললো "ডাক্তারদা আজ যদি তোমাকে ভাত দিতে বলেন, মুকুট জেলা সদরে গিয়েছে—ফল নিয়ে আসবে।"

"বিশ্বাস কর আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করেনা।" লাবণ্য তাকালো স্বামীর দিকে। "মহেশ কী ভালো হয়েছে।"

"মহেশ আর নেই লাবু। পুলিনের ছেলে বউ সব গেছে।"

"থাক আর বোলনা।" লাবণ্য বললো, "শোনবারও আর ধৈর্য নেই।" এই সময় ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন। সৌম্য হেসে লাবণ্যর দিকে তাকিয়ে বললেন। "এবার একেবারে তুই অল রাইট লাবু।"

লাবণ্যর চোখে আবার জল এল।

মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে ডাক্তার বললেন, "আবার কাঁদ্‌ছিস? তোর কী একার দুঃখ? কত মায়ের কোলের কত তাজা ছেলে চলে গেল, ভাবতো।"

বিদ্যুৎ তাঁকে বসবার আসন দিয়ে বাইরে গেছলো। বললো, "দাদা, ট্র্যাফিক কলোনীতো আপনার উপর ভীষণ খাপ্পা হয়েছে। বসন্ত রোগীকে আপনি ডিসপেনসারী ঘরে তুলেছেন। সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ছে।"

"কী করি বলো ভাই বিদ্যুৎ, ওর মুখে জল দেবার কেউ নেই, আমার নিজের কোয়ার্টারের যা অবস্থা! ভাঙ্গা চাল, ঘরের মধ্যে রোদ ঝলসে যায়। তাই আমি ওকে ডাক্তার-খানার মেঝেতে আমার নিজের মশারী আর বিছানা দিয়ে এনে রেখেছিলুম।"

বিদ্যুৎ বললো, "নন্দীর দল আপনার নামে হেড অফিসে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছে।"

ম্লান হেসে সবিতা বললেন, "এবার আর আমার মুক্তি নেই বিদ্যুৎ। তোমাদের ছেড়ে যেতে হবে। বদলির খবর এল বলে। একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবারের অপরাধ আমার অফিসের খাতায় লেখা হয়ে গেল। সরকারী ওষুধ বাইরের লোককে দাতব্য করেছি, ডিউটির সময় প্রাইভেট রোগী দেখেছি, বসন্ত রোগীকে ডিসপেনসারী ঘরে আশ্রয় দিয়েছি। দুটো য়্যানিনেমাস চিঠী? একটা রিপোর্ট, আর ক্ষমা নেই বিদ্যুৎ।"

চব্বিশ

বিদ্যুৎ বুঝি সরকারী চাকরীর নিয়ম ভেঙ্গেছে! ও সেলাইর কলে কাটা কাপড় হাটে হাটে বেচে দুই দফা উপার্জন করেছে। অফিস থেকে কৈফিয়তের তলব এসেছে, উপযুক্ত উত্তর চাই নচেৎ সাসপেণ্ড করা হবে।

লাবণ্য ওকে আশা দিয়েছে, আশ্বাস দিয়েছে। একখানা ইস্তফা পত্র লিখে ফেললো।

মৃণালিনী ওঁর আশ্রমে দুজন কর্মী পেয়ে খুশি হয়েছিলেন। ওদের দুজনকে সাদর আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, "আশ্রমকে দিনের পর দিন বাড়িয়ে চলেছি, মনের শ্রম দিতে পারে এমন শ্রমিক পাইনা। —যারা ভারতবর্ষের আদর্শবাদে একটা বাস্তব রূপ দিতে পারবে।"

"ভারতবর্ষের আদর্শবাদের আসল রূপ যে কী তাই নিয়েই তো গরমিল ঘটে যায় মাসীমা", বিদ্যুৎ বললো, '-মার্কস-এর জীবন দর্শন কর্মবীর লেনিন আর স্ট্যালিন রূপদান করেছেন। আধ্যাত্ম-বাদের ভাবালুতা আমাদের আলো দেখয় না, শুধু ছায়া ফেলে।"

পড়ন্ত সূর্যের বর্ণ সমারোহ আশ্রমকে তখন রাঙ্গিয়েছিল—চৈত্রের বাতাসে আমের মুকুলের সুগন্ধ। প্রাঙ্গনের সুপারী কুঞ্জের বেদীকামূলে মৃণালিনী চরকায় সুতো কাটছিলেন, লাবণ্য সেলাইর কলে কাটা কাপড় সেলাই করছিল। এইমাত্র কোহিনুর বিদ্যুৎ এবং মুকুট বাইরে থেকে ফিরেছে।

লাবণ্য সেলাই থামিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললো, "অধ্যাত্ম-

বাদকে তুমি ভাবালুতা বলতে পারোনা। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, অন্যায়কে নির্মূল করবার অস্ত্র মানাসক শক্তি, ঈশ্বরের সাধনাই মানুষকে দুর্জয় শক্তি দিতে পারে।"

মৃণালিনী একটু হাসলেন, দুশোবছরের শোষনে যে হাড়ে ঘুণ ধরে রয়েছে তারা ঈশ্বরের সাধনা করে মানসিক শক্তি অর্জন কেমন করে করবে লাবু? তাই মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ বাস্তবে রঙ ধরতে পারেনা। ক্রুর সাপের বিষাক্ত নিঃশ্বাসের মধ্যে অহিংসবাদ যে কেবল মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনিই খেলে।"

বিদ্যুৎ বললো, "মহাত্মাগান্ধীকে আমরা অসম্মান করিনা লাবু। তাঁর গঠন মূলক আদর্শ ব্যক্তিগত জীবনে আমরা গ্রহণ করতে পারি, ধর্ম জীবনেও তাঁকে গুরু বলে মনে করতে পারি, কিন্তু রাজনৈতিক পটভূমিতে তাঁর নীতি আমরা স্বীকার করতে পারিনা।"

লাবণ্য নিরুত্তর। সমগ্র স্নায়ুতে বুঝি ও আগামী দিনের নতুন ভারতবর্ষের উদাত্ত আহ্বানকে অনুভব করছিল। কোহিনুর বললো, "কোনও আদর্শবাদের কথনও মৃত্যু হয়না বৌদি, মহাত্মাগান্ধীর জীবন স্বপ্নের যে টুকু বাস্তব ধর্মী, সত্য এবং সুন্দর অবশ্যই আমরা গ্রহণ করবো। বিবেকানন্দের জীবনবানীতে আমরা রূপ দান করব, নেতাজী সুভাষের ত্যাগ ও তপস্যাকে অনুসরণ করবো।"

"গুড," এই সময় সবিতৃ প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হলেন। বেদীমূলে উপবেশন করে বললেন, "নতুন পৃথিবীতে অর্থ-নৈতিক কাঠামো হবে অত্যন্ত সমাজ সচেতন। উপর তলা থেকে নীচের তলার মানুষ পর্যন্ত যেদিন স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করবে সেদিন সত্যই মুকুল ফুটে উঠবে।"

ডাক্তারের দিকে সকলে এক সঙ্গে তাকালো। মৃণালিনী বললেন,

"কতদিন পর এলেন ঠাকুরপো! মাস দেড়েক তো যমের সঙ্গেই যুদ্ধ করলেন। সকলেই বলে—ডাক্তার বাবুর ঋণ আমরা কোনও দিন শোধ করতে পারবোনা। আর একটু হাসলেন ডাক্তার। "ওদের এ কৃতজ্ঞতাও আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকবে, সরকারের কাছে আমি পুরস্কার পেয়েছি, আমাকে আসাম প্রদেশে বদ্‌লি করেছে।"

"বদ্‌লি? বদ্‌লি করেছে।" কয়েকটি বিস্ময়ের কণ্ঠ এক সঙ্গে কেঁপে উঠে থেমে গেল। ডাক্তার বললেন, "ওরা আমায় দুবার ক্ষমা করেছে। আমি নাকি সরকারী ওষুধপত্র বাইরে অপব্যয় করি, আমি ডিউটির সময় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করি, আমি বসন্ত রোগীকে হাস-পীতালে তুলেছি। আর আমার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নয়।"

কয়েকমুহূর্ত নীরব থেকে মৃণালিনী বললেন, "আপনি যে বলেছিলেন আমাদের আশ্রমে আসবেন, কবে আসছেন বলুন?"

ডাক্তার বললেন, "আরও কিছুদিন আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে বউদি। আমাদের ডাক্তারদের উপরে অন্যায় অবিচার করা হয়েছে? তাই সহকর্মীরা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবিধান চেয়েছে। এ সময় আমি সরে দাঁড়ালে ওরা দুর্বল হয়ে পড়বে।"

মৃণালিনী নিরুত্তর। ওঁর বুকের মধ্যেও সহকর্মীর এক ইতিহাস আগুনের অক্ষরে লেখা রয়েছে। কোনও দিন হয়তো সে বেদনার আগুন নিভবেনা। একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি যেন কোনদিকে চেয়ে রইলেন। ডাক্তার এবার কোহিনুর, মুকুট, বিদ্যুৎ এবং লাবণ্যর দিকে তাকালেন—তোমরা যে সব চুপ করে রইলে? আষাঢ়ের মেঘের মত মুখগুলো থমথম করছে, দুঃখ কী? আবার তো আমি ফিরে আসছি। তোমরা কিন্তু থেমোনা।

পঁচিশ

দেখতে দেখতে ডাক্তারের বিদায়ের দিন আসন্ন হয়ে এল। জিনিষ পত্র গোছগাছ সুরু হয়ে গেল, কোয়ার্টারের পাশের দিককার একটা লাইনে মালগাড়ীর একখানা কামরা দেওয়া হয়েছে, কুলি আসবাব পত্র বোঝাই করছিল।

সন্ধ্যে সাতটায় ওঁর ট্রেণ। বিকেলবেলা আনুষ্ঠানিক আয়োজনের মধ্যে দিয়ে একটু বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল।

ডাক্তারের কোয়ার্টার সংলগ্ন বিস্তৃত মাঠখানার ঘাসের ওপর একটা সতরঞ্জি বিছানো, একধারে কয়েকটি চেয়ার টেবিল আর বেঞ্চ পাতা হয়েছে, রং বেরঙের ফুল ও পাতার পুষ্পাধারটী সুসজ্জিত। দেবদারু আর আমের পল্লব তোরণদুয়ারের শ্রী বৃদ্ধি করেছে। মৈনাক সভাপতির আসন গ্রহণ করবে, গোপা একটি উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবে। তোরণ দুয়ারের প্রান্তে দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে আশ্রমের স্বেচ্ছা সেবকরা দাঁড়িয়েছিল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়নি তখনও। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে চাষাভুষো মানুষেরা দলে দলে সভা প্রাঙ্গনে এসে জমা হতে লাগলো। শ্রমিক বস্তি উজাড় করে কাতারে কাতারে মানুষ ক্রমান্বয়ে সারির পর সারি দিয়ে আসতে লাগলো। এই মানুষ গুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলে সারা ভারতবর্ষের একটা রূপ চোখের সামনে ফুটে ওঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দী শোষিত কঙ্কালসার ভারতের ক্ষুধার্ত আত্মা এরা।

জীর্ণ ওদের চেহারা, পরিধানে লুঙ্গি না হয় লেংটি, রুক্ষ এক

মাথা বড় বড় চুল, হিন্দু মুশলমানের বিভেদ নীতি ওদের জানা নেই। পাশাপাশি গ্রামে ওরা বাস করে। পরস্পরের দুঃখ ও সুখে পরস্পর সমান অংশ গ্রহণ করে। সম্প্রদায়িক বিষে আর কলুষে তখনও ওরা জর্জরিত হয়ে উঠতে পারেনি।

ডাক্তারবাবুর ঋন ওরা কোনদিন শোধ করতে পারবেনা, আসন্ন বিচ্ছেদবেদনায় বুকের মধ্যে ওদের তুমুল ঝড় আলোড়ন তুলেছে।

ইতিমধ্যে রেলওয়ে ট্র্যাফিক এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি কর্মীবৃন্দ পৌঁছে গেছে। মৈনাক ও গোপা আসন গ্রহণ করেছে। মৃণালিনী, লাবণ্য, মুকুট ও কোহিনুর সবাই উপস্থিত। ডাক্তারখানার হিসাব নিকাশ নতুন ডাক্তারের হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার সভার-দিকে এগিয়ে এলেন। তোরণদুয়ারে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকগণ জাতীয়তাবাদী ধ্বনিতে ও সামরিক কায়দাব অভিবাদন জানাল।

সভ্য সমাজের মার্জিত রুচি বোধ ওদের অজানা। সভায় নিয়মানু-বর্তিতা শৃঙ্খলা রক্ষা হতে পাবলোনা। একজন তরুণবয়সের নিরক্ষর চাষা প্রাণ সঞ্চিত দরদ উজার করে বক্তৃতা সুরু করে দিল।

"ডাক্তারবাবু তুমি আমাদের গরীবের বাপ মা, হতভাগ্যদেব প্রাণের বন্ধু ছিলে। তুমি এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, ধারণা করতে পারিনি। আমাদের মন্দ ভাগ্য তাই তোমার মত দেবতাকে আমরা মাত্র একটি বৎসর কাছে পেয়েছিলুম। দুঃখই আমাদের ভোগ করতে হবে, কেননা প্রতিকারের কৌশল আমাদের জানা নেই। আমরা হতভাগ্য পশুরদল মুখ বুজে মাথা পেতে অত্যাচার অবিচার সহ্য করে যাবো। তোমার মহত্ব উদাবতা কোন দিন আমরা ভুলতে পারবোনা। তোমার ঋণ শোধ করবার সাধ্য আমাদের নেই। ঈশ্বরের

কাছে প্রার্থনা করি—তুমি আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এস, অসংখ্য প্রণাম তোমাকে জানাই।”

বক্তব্যর শেষে তরুণ কৃষকের চোখে টলমল্ করছে অশ্রু। দুইজন রেল-শ্রমিক এগিয়ে এসে দুইছড়া কুবচি ফুলের বন্য মালা ডাক্তারের গলায় পরিয়ে দিল। নন্দীবাবু ফিসফিসিয়ে মুকুটকে বললো, “তা সভার আয়োজন বেশ হয়েছে। ডাক্তারকে একটা রূপার ফ্রেমে বাঁধানো মানপত্র তো দিলে পারতে—”

“সোনা রূপার জৌলসে আমাদের মন ভরেনা।” মুকুটের দৃষ্টিতে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঝল্‌সে উঠলো। “ঐশ্বর্যের গোলাম আমরা হতে পারিনি, হৃদয়ের অর্ঘ্যই আমাদের একমাত্র উপাচার।”

অনেকে তখন হাতের উল্টো পিঠে চোখের জল মুছতে সুরু করেছে। মৃণালিনী, লাবণ্য, কোহিনুরের মুখ মেঘপুঞ্জিত আকাশের মত থমথম করছে। মৈনাক এবার উঠে দাঁড়িয়ে সভার নিয়ম অনুয়ায়ী ওর বক্তব্য বলতে সুরু করলো।

ঘন ঘন করধ্বনির মধ্যে মৈনাকের কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হয়ে এল। প্রত্যাভিবাদনে ডাক্তারকে এবার কিছু বলতে হয়। কিন্তু বেদনা ভারাক্রান্ত মন তাঁর এত বিচলিত, এত মানুষের দুঃখ, অভিভূত মনকে কোন ভাষায় সান্ত্বনা দেবেন? নিজের আবেগ উদ্বেলিত মনকে তিনি কঠিন আঘাতে দমন করতে পারেন। কিন্তু? কিন্তু আর আর দেরী করা চলেনা। বিদায় সময় যে আসন্ন হয়ে এল। সন্ধ্যে সাতটায় আসাম অভিমুখী ট্রেন এসে পড়বে।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সর্ব প্রথম নিজের গলার বন্য ফুলের মালা দুটী খুলে কোহিনুর ও মৈনাকের গলায় পরিয়ে দিলেন। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—

"তোমরা দুজনে হাত ধরে মানুষের সেবক ও সেবিকা হয়ো।" এবার তিনি জন সাধারণের দিকে তাকালেন—"তোমরা আমাকে ভালো বেসেছ তার জন্য আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করি, এর বেশী আজ আর কিছু বলবার আমি উৎসাহ পাচ্ছিনা—, তোমাদের ছেড়ে যেতে একান্ত দুঃখ অনুভব করছি। সম্পদের প্রতি ঐশ্বর্যের প্রতি আমার কোনও মোহ বা আকর্ষণ নেই। মানুষের এমনই ভালোবাসার মধ্যেই আমি যেন বেঁচে থাকতে পারি।"

কোহিনুর মুকুট বিদ্যুৎ লাবণ্য একে একে এগিযে এসে ওরা ডাক্তারকে প্রণাম করলো। গোপা কিছুটা আভিজাত্য বোধে কিছুটা শিক্ষার অভিমানে ডাক্তারকে অন্তরঙ্গের মত গ্রহণ করতে পারেনি। এবারবুঝি ওর শিক্ষা আর আভিজাত্যের অভিমান খানখান হযে ভাঙলো, ও এগিয়ে এসে ডাক্তারকে হেঁট হয়ে প্রণাম করলো।

মৈনাক বললো, "আজ নয় ডাক্তার মৈত্র আমার প্রণাম সেদিন নিতে আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে।'-

মৃদু হাসিতে ডাক্তারের ঠোঁট দুটী স্মিত হয়ে উঠলো। নিশ্চয় মিঃ মজুমদার, যুগল প্রনাম নিতে আসব বৈকি। সেদিন আপনি হবেন মৈনাক আর আমি হব ডাক্তার কাকা।"

মৃণালিনীর ঠোঁটের এক প্রান্তে বেদনার কালো রং থমথম করছে আর একদিকে একটু সুখের রং লেগেছে। ডাক্তারেরদিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের আশ্রম আপনার প্রতীক্ষাতেই থাকবে ঠাকুর পো। আপনরে আশীর্ব্বাদ কোহিনুর মৈনাককে যেন সুখী করে।"

এই সময স্বভার প্রসিদ্ধ কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে নন্দী বললো, "বদলীর চাকরী ডাক্তারবাবু—আবার দেখা হবে।"

স্টেশন অভিমুখে সকলে হাটতে সুরু করেছে।

মৈনাক ও কোহিনুর পাশাপাশি হাটছিল। মৈনাক অত্যন্ত সঙ্গোপনে আর সন্তর্পনে কোহিনুরের হাতে একটু মধুর চাপ দিয়ে বললো, "ডাক্তার মৈত্র তো সবার সামনে ফাঁস করে দিলেন, তারপর—"

"তারপর—" কোহিনুর বললো, "এবার ওই সরকারী গোলামীর ফাঁকা মুহুর্মুহু সেলাম আর সম্মানের মোহ মুছে ফেলে দিতে হবে।" পরম আবেগে কোহিনুরের গলার স্বর জড়িয়ে এসেছিল। সলজ্জ দৃষ্টিতে ও একবার তাকালো মৈনাকের দিকে, আবার বললো, "তুমি পারবে না মৈনাক ?"

"পারব বইকি কোহিনুর," মৈনাকের চোখে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি, কণ্ঠে মুগ্ধ সমারোহ। আসন্ন অভিমুখী ট্রেন পৌঁছে গেছে স্টেশনে। ডাক্তার নিজের কামরায় উঠে জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দাঁড়ালেন।

পাশের প্ল্যাটফর্মে ডাউন আসামের গাড়ী এসে দাঁড়াল।

সেকেণ্ড ক্লাশ কামরার দিকে চোখ পড়তে ডাক্তার একটু চমকে উঠলেন। রুনু না ? হ্যাঁ, তাইতো !

কি আশ্চর্য ! জীবনের এক অধ্যায় সমাপ্তির ক্ষণে একি নাটকীয় দর্শন লাভ হ'ল রুনুর সঙ্গে। এও হয়—ভাবতেই কেমন অবাক লাগছে।

রুনুদের গাড়ী মিনিট দুই দাঁড়িয়ে আবার চলতে সুরু করেছে। ডাক্তার আর একবার তাকালেন রুনুদের কামরায়। এবার তাঁর দৃষ্টি নিঃসংশয় হতে পারলো। একখানি বার্থে সুসজ্জিতা রুনু বসেছিল। বেনারসী শাড়ীর অবগুণ্ঠনে রুনুকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। ওর পাশে বসে কোটপ্যান্ট পরিহিত সুন্দর একজন যুবক।

ইতিমধ্যে রুনু ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে হাত তুলে অভিবাদন জানালো। ডাক্তারও হাত তুললেন, গাড়ী তখন দৃষ্টির আড়াল

বাঁক নিয়েছে। মুহূর্তের জন্যে তিনি আনমনা হয়ে গিয়েছিলেন। সত্যই আজ তিনি সম্পূর্ণ বাঁধন মুক্ত। সংসারে আকর্ষণ করবার মত আর তাঁর কেউ রইলনা। নিরবচ্ছিন্ন মুক্ত তিনি। একটি নিঃশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। হয়তো মুক্তির নিঃশ্বাস। দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকালেন স্বজন বন্ধুগণের দিকে। আত্মীয়তার হিসাব নিকাশে কেউ তাঁরা আপন নয়, অথচ হৃদয়ের কী অকৃত্রিম যোগ, এরই নাম সেই দুর্লভ ভালোবাসা।